আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন



কমলকুমার সান্যাল

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন

৪৭

১০৪৯

কমলকুমার সান্যাল

বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষ
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ, ১৯৮৩

প্রচ্ছদ :
পঞ্চানন মালাকর

মুদ্রক :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য—ছয় টাকা মাত্র।

—উৎসর্গ—

কল্যাণীয়া সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে

এই লেখকের আর একটি জীবনীগ্রন্থ :

কার্লমার্কস

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন

বাংলার এক উজ্জ্বল মনীষার নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এমন এক মনীষা যাঁর আদর্শে ও শিক্ষায়, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় বাঙালী জাতির সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। দেশের ও দশের কল্যাণে তিনি ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। জ্ঞানে, কর্মে, ও মহত্ত্বে তিনি ছিলেন অতুলনীয় মনীষা।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট (বাংলার ১২৬৮ সালে ১৮ই শ্রাবণ) যশোহর জেলার কপোতাক্ষ নদীর তীরে রাড়ুলী গ্রামে। প্রফুল্লচন্দ্রের উর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ রামপ্রসাদ রায় মুর্শিদাবাদে নবাব দরবারে কাজ করতেন। সিরাজের পতনের পর তিনি রাড়ুলী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। প্রফুল্লচন্দ্রের পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র ও মাতার নাম ভুবনমোহিনী। হরিশ্চন্দ্রের পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। ছেলেদের নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ, নলিনীকান্ত, প্রফুল্লচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র ও গোপাল। কন্যার নাম ইন্দুমতী। হরিশ্চন্দ্র এবং ভুবনমোহিনী উভয়েই সর্বপ্রকার কুসংস্কার মুক্ত ছিলেন। এঁরা জাতিভেদ মানতেন না। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে ও ইংরেজি শিক্ষা প্রচারে হরিশ্চন্দ্র অগ্রণী হয়েছিলেন। ভুবনমোহিনী দেবী গ্রহণ করেছিলেন পরোপকারের ব্রত। পিতামাতার সকল গুণ বাল্যকাল থেকেই প্রফুল্লচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে জ্ঞানে ও কর্মে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তার ফলশ্রুতি হিসেবেই তিনি মনীষীর সম্মান লাভ করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী। তাই বলে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে জগৎসংসার থেকে দূরে গিয়ে ভগবৎ সাধনায় নিমগ্ন হন নি। মানুষের মধ্যে অবস্থান করেই মানুষের উন্নতির সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তিনি প্রতিনিয়ত মানুষকে এগিয়ে চলার এবং জয়যাত্রার মন্ত্র শুনিয়েছেন।

বাল্যকাল ও কৈশোর

ছেলেদের বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্যে হরিশ্চন্দ্র সপরিবারে কলকাতায় আসেন। গ্রামের বাড়িতে থাকতেই প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে খড়ি হয় চার বছর বয়সে। প্রথমে তাঁকে পাঠশালায় ভর্তি করা হয়। পাঠশালার পড়া শেষ করবার পর তাঁকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করা হয়। হরিশ্চন্দ্র নিজেই ছেলেদের পড়াতেন। কোন গৃহশিক্ষকের অধীনে ছেলেদের পড়াবার ব্যবস্থা করেন নি। যখন তিনি দেখলেন গ্রামে ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সম্ভব নয় তখন তিনি সকলকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন।

কলকাতায় আসার পর প্রফুল্লচন্দ্রকে হেয়ার স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে (যা বর্তমানের তৃতীয় শ্রেণীর মানের অনুরূপ) ভর্তি করা হয়। হেয়ার স্কুলে তিনি তিন বছর পড়েন। তাঁর বয়স যখন বারো বছর তখন তিনি অসুখে পড়েন। অসুখের প্রকোপ এত বেশি হয়েছিল যে, সে সময়ে তাঁর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দু'বছর কাটাতে হয়। বাল্যকালে খাওয়া-দাওয়া এবং পড়াশুনা সম্বন্ধে তাঁর সময়ের কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। যখন খুশী, যতবার খুশী ততবার তিনি খেতেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যেমন তার কোন সংযম ছিল না তেমন পড়াশুনার ব্যাপারেও তাঁর কোন সংযম ছিল না। দিন রাত কেবল বই নিয়ে থাকতেন। প্রথম রাতে নটার বেশি পড়তেন না। কিন্তু রাত তিনটের সময় উঠে বই নিয়ে বসতেন। রাতে পড়বার সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একদিন প্রফুল্লচন্দ্র রাত তিনটের সময় উঠে প্রদীপ জ্বালতে গিয়ে দেখেন প্রদীপে তেল নেই। ঘরে প্রদীপের তেলও নেই। কিন্তু পড়বার এমনি নেশা যে ঘরের মধ্যে রাখা মাথার গন্ধ তেল প্রদীপে ঢেলে প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়তে বসলেন। খাওয়া এবং পড়াশুনায় সংযম না

থাকায় তিনি অসুখে পড়েন। কঠিন আমাশা রোগে এমন পীড়িত হয়ে পড়েন যে তাঁকে বাধ্য হয়ে দেশের বাড়িতে পাঠাতে হয়। ছ'বছর স্কুলের পড়া বন্ধ রেখে তাঁকে দেশের বাড়িতে থাকতে হয়।

অসুখ সেরে যাওয়ার পর প্রফুল্লচন্দ্র পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায় ফিরে আসার পর প্রফুল্লচন্দ্রকে এলবার্ট স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এই এলবার্ট স্কুল থেকেই তিনি ১৮৭৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় (সেকালের Entrance) উত্তীর্ণ হন। অসুখ সেরে যাওয়ার পর পুনরায় স্কুলে ভর্তি হলে প্রফুল্লচন্দ্র খাওয়া-দাওয়ার ও পড়াশুনার ব্যাপারে অনেক সংযমী হয়ে ওঠেন। তাঁর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। যখন তখন খাওয়া বন্ধ করে দেন। রাত নটার পর পড়তেন না এবং রাত তিনটের সময় উঠে পড়তে বসতেন না।

অসুখের সময় দেশের বাড়িতে থাকার সময় স্কুলের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক না থাকলেও জ্ঞান অর্জনের জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। দেশের বাড়িতে পিতার বেশ বড় গ্রন্থাগার ছিল। সেই গ্রন্থাগার থেকে অনেক গ্রন্থ কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। দেশের বাড়িতে তখনো যত গ্রন্থ ছিল তার সংখ্যা কম নয়। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গ্রন্থ ছিল। সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি তিনি অভিনিবেশ সহকারে পড়েন। ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়েন। ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা বেশ ভালভাবে শিক্ষা করেন। এই সব শিক্ষা প্রফুল্লচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষভাবে কাজে লেগেছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন —"He believes is doing one thing at a time and doing that well." অর্থাৎ একসময় একটা মাত্র কাজে হাত দেওয়া এবং তাই সুসম্পন্ন করা। প্রফুল্লচন্দ্র জীবনে যে সফল হয়েছিলেন তার মূলে ছিল একনিষ্ঠতা। বাল্যকাল থেকেই তিনি যে কাজে হাত দিতেন সেই কাজেই আত্মনিমগ্ন হয়ে যেতেন। বাল্যকাল থেকেই

প্রফুল্লচন্দ্র পরোপকারের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। সারা জীবন তিনি অপরের হিত সাধনের জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। বাল্যকালে তাঁর মনে যে বীজ উপ্ত হয়েছিল তাই পরবর্তীকালে ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

উচ্চশিক্ষা

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রফুল্লচন্দ্র মেট্রোপলিটান কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে) ভর্তি হন। এই সময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরেজি পড়াতেন। সুরেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসার জন্যেই তিনি উক্ত কলেজে ভর্তি হন। পরে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তখন পদার্থ বিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক জন এলিয়ট এবং রসায়ন বিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার পেডলার অধ্যাপনা করতেন। প্রফুল্লচন্দ্র এঁদের কাছে পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান পড়েন। প্রফুল্লচন্দ্রের মেধা ও আগ্রহে অধ্যাপকদ্বয় সন্তুষ্ট ছিলেন। এঁদের কাছে যে শিক্ষা তিনি পান তা পরবর্তীকালে প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষ কাজে লেগেছিল। ১৮৮০ সালে তিনি সেকালের এফ. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৮২তে তাঁর বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি পরীক্ষার আগেই ইংলণ্ডে চলে যান।

এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর হরিশ্চন্দ্রের ইচ্ছে ছিল ছেলেকে বিদেশে পাঠাবেন। কিন্তু গ্রামের কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর আর্থিক দুরবস্থা দেখা দেয়। অনেক ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন। পিতার মনোভাব এবং কষ্টের কথা চিন্তা করে প্রফুল্লচন্দ্র গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় বসেন এবং ১৮৮২ সালে তিনি উক্ত বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি লাভ করার পরেই তিনি ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। বিদেশে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চায় জাতির মুক্তি আসবে না। জাতির মুক্তি আসতে পারে বিজ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল। ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ ভালভাবে উপলব্ধি করেন। এই উপলব্ধির পরই তিনি তাঁর

প্রিয় সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চা ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তখন পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপকদ্বয় যথাক্রমে পি. জি. টেইট এবং এস. সি. ব্রাউন অধ্যাপনা করতেন। এঁদের শিক্ষাগুণে ও নিজের একনিষ্ঠতায় প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র হিসেবে খ্যাত হন। ১৮৮৫ সালে তিনি বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৭ সালে লাভ করেন ডি. এস-সি. ডিগ্রী। তাঁর রচিত প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় একই সঙ্গে তিনি হোপ (Hope) প্রাইজ পুরস্কার হিসেবে পান। এই পুরস্কারের মূল্য ছিল পঞ্চাশ পাউণ্ড। তখনকার দিনের ভারতীয় টাকায় যার মূল্য ছিল সাতশো টাকা। এই টাকা পাওয়ায় তিনি খুবই উপকৃত হয়েছিলেন। আরও কিছুদিন এডিনবরায় থেকে রসায়ন বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করেন। এই সময় অর্থলাভের আশায় তিনি আর একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রেরিত প্রবন্ধের নাম "India before and after the Mutiny". প্রতি-যোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কার লাভ করতে পারেন নি। প্রথম স্থান পান নি জ্ঞান বা মেধার অভাবের জন্যে নয়। তিনি পুরস্কার পান ইংরেজ জাতির সমালোচনা করার জন্যে। উক্ত প্রবন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র ভারতে ইংরেজ শাসনের নীতির তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। এই প্রবন্ধটি তাঁর স্বদেশ-প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ডে রসায়ন গবেষণা শেষ করে স্বদেশে ফিরে আসেন ১৮৮৮ সালে।

কর্মজীবন (প্রথম স্তর)

স্বদেশে ফিরে আসার পর প্রথমে প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে সামান্য চাকরীতে যোগ দেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। গবেষণার সুবিধার জন্যেই তিনি সম্মানের প্রশ্নকে বড় করে না দেখে পদ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। পরাধীনতার জ্বালা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাছাড়া চাকরীর প্রতি একটা ঘৃণা তাঁর অন্তরে বাসা বাঁধে। জগদীশচন্দ্রকেও চাকরির গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে জেনে দুঃখ পান। এই সময় জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজে কর্মজীবন শুরু করেই তিনি ছাত্রদের বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন। কলেজে গবেষণার তেমন সুবিধা ছিল না। গবেষণার প্রয়োজনীয় সব জ্ঞানের বড়ই অভাব ছিল। কিন্তু কোনদিন তিনি ধৈর্য হারান নি। ছাত্রদের মনে আশার সঞ্চার করবার জন্যে বলতেন ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ফলে ইউরোপে নিত্য নতুন বিজ্ঞানের আবিষ্কার ঘটছে। ইউরোপের তুলনায় ভারতের অবস্থা অত্যন্ত করুন। একমাত্র ছাত্ররাই পারে অবস্থার উন্নতি ঘটাতে। চেষ্টা করলে, উৎসাহ ও আন্তরিকতা থাকলে ভারতীয় ছাত্ররা ইউরোপের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য এজন্যে তাদের অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তবু হতাশ হওয়ার কিছু নেই। তাঁর উৎসাহে বেশ কিছু ছাত্র বিজ্ঞান চর্চার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ব্যাপারটিকে তারা আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করে।

তাঁর দীর্ঘ প্রচেষ্টা সফল হতে শুরু করে ১৯১০ সাল থেকে। অনেক চেষ্টার পর তিনি বিজ্ঞান চর্চার জন্যে গবেষণা বৃত্তি চালু করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন এই বৃত্তি নিয়ে অনেকেই উচ্চ

শিক্ষালাভের পর হয় সরকারী চাকরীতে যোগ দেয় নয়তো ওকালতী ব্যবসা শুরু করে। এতে তিনি যেমন দুঃখ পান তেমনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। নিজের গবেষণার জন্যে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ছিল না। অনেক চেষ্টার পর সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়। কিন্তু তেমন উৎসাহী কেউ এ-বিষয়ে এগিয়ে আসছে না দেখে বেদনা বোধ করেন। তবে কি তাঁর সাধনা ও বাসনা ব্যর্থ হয়ে ওঠে? মনের মধ্যে বেদনা নিয়ে তিনি কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। অসীম ধৈর্য তাঁর। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাঁর সাধনা ও বাসনা সার্থক হতে আরম্ভ করে।

১৯১০ সালের পর বেশ কয়েকটি ছাত্র পান যাঁরা বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আন্তরিকতার পরিচয় দেন এই সব ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যতীন্দ্রনাথ সেন, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, হেমেন্দ্রকুমার সেন, নীলরতন ধর, রসিকলাল দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাথ সাহা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিমানবিহারী দে প্রভৃত কৃতী ছাত্রের দল শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্রকে ঘিরে বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সব ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন পরবর্তীকালে সুনাম অর্জন করেছিলেন। মেঘনাদ সাহাতো বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে সমবেত ছাত্রদের রচিত মৌলিক প্রবন্ধ ইউরোপের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ছাত্রদের রচিত মৌলিক প্রবন্ধগুলি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে উচ্চ প্রশংসিত হলে প্রফুল্লচন্দ্র আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন। বিশ্ববিজ্ঞান জগতে বাঙ্গালী যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে এতে তিনি যুগপৎ আনন্দিত ও গর্বিত হতেন। এসবই তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের উন্নতির জন্যে বিদেশের গবেষণাগারগুলি পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের নিমিত্ত সরকার ১৯০৪ সালে প্রফুল্লচন্দ্রকে ইউরোপে প্রেরণ করে। পশ্চিম ইউরোপের প্রধান কয়েকটি দেশের (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মান) গবেষণাগার ও যন্ত্রপাতি পরিদর্শন করে ফিরে আসেন। তিনি ফিরে আসার পর

প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিজ্ঞানের গবেষণাগারটিকে প্রসারিত করেন এবং অনেক নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠতার জন্যে কলেজের রসায়ন গবেষণাগারটি আধুনিক গবেষণাগারে রূপ নেয়।

১৮৯৫ সালে প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে স্মরণীয়। এই বছর তাঁর আর এক সাধনা সার্থক হয়। "Mercurous Nitrite" তাঁর গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হয়। ১৯০২ সালে তাঁর রচিত মৌলিক গবেষণা পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকের নাম "Hindu chemisty". এই গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেন প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে রসায়ন বিজ্ঞান কত উন্নত ছিল। সরকার যখন তাঁকে ইউরোপে প্রেরণ করেন তখন তাঁর মৌলিক গবেষণা আবিষ্কৃত হয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাই ইউরোপের যেখানে তিনি গিয়েছেন সেইখানেই সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থটিও বিজ্ঞানী মহলে সমাদর লাভ করেছিল। ইউরোপের বহু বিজ্ঞানী তাঁকে সম্বর্ধনা জানান।

প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রধান কানিংহামের মৃত্যুর পর ১৯১০ সালে প্রফুল্লচন্দ্রকে বিভাগীয় প্রধানের পদ দেওয়া হয়। অবসর গ্রহণের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১২ সালে লণ্ডনে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অধীন সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে যোগদানের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চারজনকে মনোনীত করে। প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অন্যতম। লণ্ডনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রফুল্লচন্দ্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরও ছাত্রদের পক্ষ সমর্থন করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই সময় ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. এস-সি ডিগ্রী প্রকাশ করে এবং বাংলা সরকার তাঁকে সি. আই. ই. উপাধি প্রদান করে।

বিদেশে থাকার সময় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একটি শুভ সংবাদ প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রেরণ করেন। শুভ সংবাদটি হলো বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা। তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের দানে এবং

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই কাজটির শুভ সূচনা হয়। এদের দানে ও প্রচেষ্টায় ১৯১৪ সালে বিজ্ঞান কলেজের নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। বিজ্ঞান কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রধান দায়িত্ব ভার গ্রহণের প্রস্তাব দেন। প্রফুল্লচন্দ্র এই আহ্বানে সাড়াদেন। ১৯১৬ সালে সরকারের অনুমতি নিয়ে বিজ্ঞান কলেজে যোগ দেন। এর দু'বছর পর ১৯১৮ সালে তিনি সরকারী কাজ থেকে অবসর নেন। ১৯২১ সালে তাঁর বয়স ষাট বছরে পড়ে। এই সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছেড়ে দিতে চান। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনুরোধ করেন আরও কিছুদিন কাজ করার জন্যে। কারণ তিনি পদত্যাগ করলে বিজ্ঞান কলেজের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিতে পারে মনে করে তাঁকে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়। প্রফুল্লচন্দ্র থাকতে রাজী হন। কিন্তু তাঁর একটি শর্ত ছিল। শর্তটি হলো তিনি কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করবেন না। এবং তাঁর পারিশ্রমিকের টাকা বিজ্ঞানের উন্নতিতে ব্যয় করতে হবে। কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে রাজী হন। দেখা যায় এইভাবে তিনি এক লক্ষ আশি হাজার টাকা ত্যাগ করেন।

কর্মজীবন (দ্বিতীয় স্তর)

প্রফুল্লচন্দ্র কেবলমাত্র বিজ্ঞানের শিক্ষা কার্যে আত্মনিয়োগ করে এবং ছাত্রদের মন বিজ্ঞানাভিমুখী করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। তিনি জানতেন বিজ্ঞান প্রয়োগ প্রধান শাস্ত্র। অর্থাৎ বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করলে বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেই হবে না। বিজ্ঞানের প্রয়োগ না করতে পারলে বিজ্ঞান শিক্ষা সার্থক হয় না। সেইজন্যে তিনি রসায়নের প্রয়োগশালা রূপে বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়ে তোলেন। নিজের সঞ্চিত সামান্য মূলধন নিয়ে ১৮৯২ সালে পত্তন করেন বেঙ্গল কেমিক্যাল। প্রথমে প্রতিষ্ঠানটির পত্তন হয় তিনি যেখানে থাকতেন সেই বাড়িতেই। সে সময়ে তিনি থাকতেন ৯১নং আপার সার্কুলার রোডে বর্তমানে যার নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। ১৮৯৫ সালে তাঁর গবেষণার ফল স্বরূপ আবিষ্কৃত হয় **Mercurous Nitrite.** এই বছরই গন্ধক দ্রাবক প্রস্তুত করবার যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসে। প্রকৃতপক্ষে এই বছর থেকেই বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯০২ সালে তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধনে প্রতিষ্ঠানটিকে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করেন। বলতে গেলে জীবনের রক্ত দিয়ে তিনি প্রাতিষ্ঠানটি গড়েছিলেন। শিক্ষকতার জন্যে তিনি যে অর্থ পেতেন তার প্রায় সবটাই জমিয়ে প্রতিষ্ঠানটির পত্তন করেছিলেন। তাঁর আজীবন সাধনার ও বাসনার ফলশ্রুতি স্বরূপ যে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা হয়োছল তা আজো মানিকতলায় বর্তমান।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন বিজ্ঞান সাধক। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন বিজ্ঞান সাধনায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে গবেষণার মধ্যে দিয়ে বা বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাঁর বিজ্ঞান সাধনা সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতে রসায়ন বিষয়ে গবেষকদের

নিয়ে তিনি একটি সঙ্ঘ গড়েছিলেন। ভারতীয় রসায়ন গবেষকদের লিখিত প্রবন্ধ ইউরোপের পত্র-পত্রিকায় স্থানাভাবে প্রকাশিত হোত না। এই সব গবেষকদের অসুবিধা ও সমস্যার কথা অনুধাবন করে তিনি সঙ্ঘ গড়েন। এর নাম ভারতীয় রসায়ন সমিতি। এই সমিতি গড়ার ফল হয়েছে সুদূর প্রসারী। প্রফুল্লচন্দ্র নিজে এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলে মনে করতেন। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গবেষকগণ নিজের নিজের গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ লাভ করেন এবং বিভিন্ন স্থানে গবেষণারত গবেষকগণ পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান।

বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষকদের গবেষণাবৃত্তির জন্যে তিনি দুলক্ষ টাকা দান করেছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ছাড়া অন্যান্য অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, কোন প্রতিষ্ঠানের উৎসাহদাতা ও পরামর্শদাতা ছিলেন। বাঙালীর যে কোন গঠনমূলক কাজের তিনি ছিলেন নিরলস উৎসাহদাতা। বিজ্ঞান সাধক প্রফুল্লচন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"জ্ঞানে ও কর্মে প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন খুব বড়। বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল দেশ-বিদেশে। বহু মৌলিক গবেষণা এবং হিন্দু রসায়নের ইতিহাস রচনা হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ দান। প্রেসিডেন্সি কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ পদে আসীন। অধ্যাপনায় তাঁর যশ ছিল অতুলনীয়। তিনি যে জ্ঞানী ও কর্মী রাসায়নিকদলের গঠন ও নিখিল ভারত রাসায়নিক সমিতির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তার ফলে আজ ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞান সমাজে ভারতবাসীর সম্মান গেছে বেড়ে। বিজ্ঞানকে সাধারণত বলা হয় প্রয়োগ প্রধান শাস্ত্র। কারণ শুধু জ্ঞানে নয়, ঐ জ্ঞানের ব্যবহারে বা প্রয়োগেই হচ্ছে বিজ্ঞানের বিশেষত্ব। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে শুধু ধ্যান-ধারণায় আবদ্ধ করে রাখলে মানুষের

বহুবিধ কল্যাণের পথ হয়ে যেত রুদ্ধ। বিজ্ঞানীরা তাই জ্ঞানকে পরিণত করেন কর্মে। এ না হলে বিজ্ঞানের অসাধারণ শক্তি বা প্রতিপত্তি যেত লোপ হয়ে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাই তাঁর জ্ঞানকে বিনিময় করেছিলেন ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন কর্মে। তার ফলে গড়ে উঠেছে বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিকেল নামে তাঁর সুবিখ্যাত রাসায়নিক কারখানা। দেশের কল্যাণ ও গরীবের তরফ হতে আচার্য রায়ের এ কর্মানুষ্ঠানের তুলনা নাই। এ ছাড়া, বাঙলার বহুবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন উদ্যোগী নেতা ও উৎসাহদাতা।"

বিজ্ঞান সাধক প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালীর বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে যে কতদূর চিন্তা করতেন তার পরিচয় নিহিত আছে তাঁর বিভিন্ন ভাষণের মধ্যে। বাংলা ১৩১৫ সালে রাজসাহীতে দ্বিতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন—"গত কয় বৎসর বাঙলা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্ত-গুলিই পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীভুক্ত। দুই একখানি মাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের বর্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হইয়া ইউরোপ খণ্ডে ও এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন।...বাঙলার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগকে শিক্ষার পথ প্রসরতর করা কর্তব্য। ...জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানব শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে।...সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াছে যে, বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। কিন্তু বাঙলা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদী ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিরি গহ্বরে, অনন্ত পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক

সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে জ্ঞান-পিপাসুর যে কত প্রকার অনুসন্ধানের বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাংলার দোয়েল, বাংলার পাপিয়া, বাংলার ছাতারের জীবন কথা কে লিখিবে? বাংলার মশা, বাংলার সাপ, বাংলার মাছ, বাংলার কুকুর ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? এদেশের সোদাল, বেল, বাবলা ও শ্যাওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে? এদেশের ভিন্ন কৃষি প্রণালী, প্রাচীন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতিতে এসবের ভিতরে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না? রসায়ন পদার্থবিদ্যাদি শাস্ত্র সন্ধন্ধে যাহাই হউক না কেন প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা এবং ভূ-তত্ত্ববিদ্যার মৌলিক গবেষণার যে বিরাট যন্ত্রাগারের অভাবে কতদূর চলিতে পারে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ......মানবতত্ত্ব (Anthropology), পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, লোকতত্ত্ব (Ethnology), ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা হইয়া যাহাতে তৎ তৎ বিষয়ক গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় প্রচারিত হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।"

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক এই রচিত না হওয়ায় প্রফুল্লচন্দ্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচিত না হলে বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞানের গবেষণা ফলবতী হবে না—একথা তিনি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞানের যেসব শাখায় গবেষণার জন্যে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন সেসব শাখার কথা বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় গবেষণা না হওয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বাঙালীর অলসতা, নিশ্চেষ্ট ভাব এবং পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকার ঘটনা তিনি কোনদিনই মেনে নিতে পারেন নি। আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি হচ্ছে না কেন সে সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন—"আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি হইতেছে না, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, যাঁহারা শিক্ষকতা করেন তাঁহারা কেবল উপাধিধারী মাত্র। জাপান,

ইউরোপ এবং আমেরিকাতে যাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের স্ব স্ব বিভাগে মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হন। এই পথ অবলম্বন করা হয় নাই বলিয়া ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষা ফলপ্রসূ হয় নাই।" (বিজ্ঞান সভা পুরাতন ও নূতন)

প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস করতেন জাতীয় সম্পর্কের মূলে আছে বিজ্ঞানের শক্তি। জাতীয় সম্পদকে কাজে লাগাতে হলে চাই বিজ্ঞান শিক্ষা এবং প্রয়োগ। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—"বিজ্ঞান সাধনার ফলে ইউরোপ ও আমেরিকা আজ পৃথিবী জয় করিয়াছে। শিল্পে, বাণিজ্যে, অর্থে, স্বাস্থ্যে ও দুর্জয় ক্ষমতায় জগতের মধ্যে তাহারা আজ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিজ্ঞান অনুশীলনে একাগ্র সাধনা করিয়া তাহারা যেরূপ দ্রুত ও আশ্চর্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়। আমাদের এই দরিদ্র দেশের সম্পদবৃদ্ধি করিতে হইলে, জাতীয় শক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞানের সাধনা ও বিজ্ঞান অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন।" (জাতীয় সম্পদের মূলে বিজ্ঞানের শক্তি)।

বিজ্ঞান সাধক প্রফুল্লচন্দ্র অনেকবার বলেছেন প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের চর্চা কিরূপ ছিল। যে সময়ে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু আধুনিক ভারতের তেমনভাবে বিজ্ঞান চর্চা হচ্ছে না দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। প্রাচীন ভারতের কথা বলতে তিনি গর্ববোধ করেছেন। তুলনায় এ ব্যাপারে আধুনিক ভারত অনেক পেছিয়ে আছে। বিদেশের বৈজ্ঞানিকগণ কিভাবে কত কষ্ট করে, কত বিপদের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা করে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছে তার উল্লেখ বারে বারে করেছেন।

বিজ্ঞান সাধক প্রফুল্লচন্দ্র যা চেয়েছিলেন তা আজো পূর্ণ হয় নি। আজ বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু বিজ্ঞানের অনুশীলন

তেমনভাবে হচ্ছে না। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার কিছু উন্নতি ঘটলেও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে নি। আর মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা পূর্বের তুলনায় কিছু মাত্র উন্নত হয় নি। যদিও পূর্বের তুলনায় পাঠ্য পুস্তকের বাইরে সাধারণ পাঠকের উপযোগী কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হচ্ছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃ-ভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ এবং অনুবাদ গ্রন্থ মোটেই রচিত হয় নি। আচার্য যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বপ্ন আজো বাস্তবে রূপ পায় নি।

ব্রাহ্মসমাজের সভ্য

প্রফুল্লচন্দ্র যখন এলবার্ট স্কুলে পড়েন তখন সেই স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যালয়ের ব্রাহ্ম শিক্ষকদের সংস্পর্শে ও সাহচর্যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। ১৮৮২ সালে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন। ব্রাহ্মসমাজের সভা-সমিতিতে কিছু বলবার জন্যে আহ্বান জানালে তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিতেন। ব্রাহ্মসমাজের বহু সভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৯৩৬ সালে টাঙ্গাইলে ব্রাহ্মসম্মিলনীর ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা স্মরণীয়। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হলেও প্রফুল্ল-চন্দ্র ছিলেন সকল প্রকার ধর্মান্ধতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। জাতিভেদ তিনি মানতেন না। জাতিভেদ প্রথাই যে জাতির উন্নতির পথে অন্তরায় সে কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। (বিষয়টি পরে আলোচিত হবে)।

জীবনযাত্রা ও আচার-আচরণ

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনযাত্রা ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। খাওয়া-দাওয়া ও পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানের। জাঁক-জমক তিনি পছন্দ করতেন না। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ। নিয়মানুবর্তিতা ও সময় জ্ঞান তাঁর ছিল অসাধারণ। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই গুণগুলি তাঁর বর্তমান ছিল। শ্রমের প্রতি তাঁর মর্যাদা ছিল। কোন-প্রকার শ্রমকে তিনি হীন মনে করতেন না। অল্পেই তিনি সকলকে বুকে টেনে নিতে পারতেন।

তিনি যেভাবে জীবনযাপন করতেন ঠিক সেইভাবেই জীবনযাপন করতে ছাত্রদের উপদেশ দিতেন। ছাত্রদের তিনি পুত্রের মত স্নেহ করতেন। ছাত্রদের জন্যে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ছাত্রদের সামনে তিনি মানব জীবনের মহৎ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই পরবর্তী সময়ে যশস্বী হয়েছেন। অগণিত ছাত্রকে তিনি জীবনের পথে এগিয়ে চলার জন্যে সাহায্য করেছেন। দুঃস্থ ছাত্রদের পড়বার ব্যবস্থা করেছেন। আর্থিক সাহায্য যে কতজনকে করেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। উচ্চশিক্ষার জন্যে গবেষণা বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন। ছাত্রদের সুবিধার জন্যে তিনি বহুবিধ ব্যবস্থা করেছেন। ছাত্রদের দুঃখে তিনি দুঃখ পেতেন। তাদের সুখে আনন্দিত হতেন। আর তাদের গৌরবে গৌরবান্বিত হতেন।

অন্যের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে তিনি সাক্ষ্যনীতি গ্রহণ করেছিলেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলকে সমান চোখে দেখতেন। কাউকে ঘৃণা করতেন না। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করতেন না। যে কোন জাতের মানুষ তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি কাউকে না বলতে পারতেন না। প্রফুল্লচন্দ্র জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন। জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতাই যে

জাতি গঠনের অন্তরায় একথা বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি। বাংলা ১৩২৯-এর বিকাশ পত্রিকায় এ সম্বন্ধে বলেছেন—"অস্পৃশ্যতার পাপ বক্ষে ধারণ করিয়া, আজ কয়েক শত বৎসর ধরিয়া তাহার জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে, ভাবিয়া দেখা যাক। বাঙ্গালার লোক-সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান। তিনি যাহাই বলুন না কেন, ইহাদের ধমনীতে হিন্দু রক্ত প্রবাহিত। কেবল আমাদের অনুদারতা ও অস্পৃশ্যতা রূপ পাপের ফলে আজ ইহাদিগকে আমরা হিন্দু সমাজ হইতে হারাইয়াছি। আড়াই শত—তিন শত বৎসর পূর্বে যখন মুসলমান বীরগণ তাঁহাদের জয় পতাকা তুলিয়া মানবের ভ্রাতৃত্ব ও একত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন; তখন ঝাঁকে ঝাঁকে তথাকথিত নিম্ন-বর্ণের হিন্দুগণ ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল।...আজও আমরা নমঃশূদ্র, ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণী—যাহারা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ, বলবীর্যে শ্রেষ্ঠ,—তাহাদিগকেই অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছি এবং কর্তৃপক্ষদিগকে ভেদনীতি অবলম্বনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছি।...ব্রিটিশ উপনিবেশে আমরা ভারতবাসী ও শ্বেতাঙ্গের মধ্যে সাম্যনীতির দাবী করি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের ভাইদের প্রতি তাহার সম্পুর্ণ বিপরীত ব্যবহার করি।......যখন আমরা আমাদের স্বজাতি ও স্বধর্মী লোককে শৃগাল-কুক্কুর অপেক্ষাও অধম জ্ঞান করি, তখন কোন্ মুখে আমরা জাতীয়তার দাবী করি—বুঝতে পারি না। এই পাপের ফলে আমরা কি জাতীয়তার দাবী করিবার সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হই নাই? বিশেষতঃ আমাদের উচ্চশিক্ষিত লোকেরাই সকলের চেয়ে বেশী অপরাধী।...চরিত্রগত দুর্বলতাই হিন্দু জাতির অধঃপতনের প্রধান কারণ।...কোন আর্য কখনও বাঙ্গালায় আসিয়াছেন কিনা জানি না। আসিয়া থাকিলেও এই শত শত বৎসর ধরিয়া রক্ত মিশ্রণের ফলে বাঙ্গালীর ধমনীতে বিশুদ্ধ আর্য রক্ত অনুবীক্ষণ দিয়াও খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। অতএব আর্য-অনার্য এইসব বৃথা গর্বমূলক ভাব ত্যাগ

করিয়া উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ সকলে মিলিয়া এক বাঙ্গালী জাতি গঠিত হউক তবেই জাতির কল্যাণ হইবে।”

ব্রাহ্মণরাই অস্পৃশ্যতার জন্যে দায়ী একথা কম্বুকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে শ্লেষ ও ব্যঙ্গে তীব্র কষাঘাত হেনেছেন। ঝালকাটি বন্দরে যোগি সম্মিলনীর অধিবেশনে এক বক্তৃতায় তিনি ব্রাহ্মণদের একহাত নিয়েছেন—“সভাপতি মহাশয় আপনারা ব্রাহ্মণ হউন, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের ঐ ধাপ্পাবাজির অনুকরণ করিবেন না। যে অন্যের সম্মান বোঝে না, সে আত্মমর্যাদাও বোঝে না। যাহার নিজের প্রাণ নাই, সে অপরের ব্যথা বুঝিবে কিরূপে? ধাপ্পাবাজি করে অপরের উপর প্রতিষ্ঠা করা, অবনতের উপর অত্যাচার করা আর বেশিদিন চলবে না। জাতিভেদের ফলে হিন্দুর সর্বনাশ হইয়াছে। হিন্দু জাতিকে বাঁচাইতে হইলে পরস্পরের প্রতি সম্মান করা চাই, অন্যের প্রাণের ব্যথা বোঝা চাই।...যাহারা হিন্দু জাতির সর্বস্ব তাহাদের ত্যাগ করে, তাহাদের নির্যাতন করে কিরূপে হিন্দুজাতি বাঁচিয়া থাকিবে? কথায় বলে জোর যার মুলুক তার, লাঠি যার মাটি তার—আপনারা নিজের জোরে হিন্দু সমাজে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করুন। আত্মশক্তির উপর নির্ভর করুন। আপনারাও বাঁচবেন, হিন্দুজাতিও বাঁচিবে।”

নিজের গ্রামের স্কুলে ছাত্রদের অস্পৃশ্যতা বর্জনের আবেদন জানিয়ে বলেন—“মানুষ মানুষকে ছোঁয় না। ইহার চেয়ে যে আর কিছু পাপ থাকিতে পারে তাহা আমার কল্পনাতীত। ইহা কখনই ধর্ম হইতে পারে না। ইহা অপধর্ম, অধর্ম, কুধর্ম।.........হিন্দু সমাজ আজ জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বহুদিনের সঞ্চিত কুসংস্কার-রাশি সমাজের দেহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে জ্বরাগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ধর্মের নামে এরূপ ভণ্ডামি ও কপটাচার আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। লেমনড খাও, বরফ খাও তাহাতে জাতি যাইবে না। কিন্তু তথাকথিত অস্পৃশ্যের ছোঁয়া জল খাইলেই সর্বনাশ। দেশের লক্ষ লক্ষ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আসিয়াছে এবং

ইহার ফলে যে পাপ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্তের দিন আসিয়াছে। ....জীবনযাত্রার পথে অনেক বাধা আসিবে তাহাতে চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না ; সংগ্রাম করিতে হইবে, জয়ী হইতে হইবে। প্রত্যেক মানুষের, প্রত্যেক জীবের সহিত একটি প্রাণের একটি দরদের সম্বন্ধ স্থাপন কর। দেখিবে জগতের সবই সুন্দর।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন মানবতার পূজারী। মানবতা তাঁর জীবনের ব্রত। একদিনের জন্যেও এই ব্রত ভঙ্গ হয়নি বাল্যকালে পিতা-মাতার কাছ থেকে যে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন আজীবন সেই শিক্ষাকেই আঁকড়ে ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে চলার পথে অনেক বাধা বিপত্তি এসেছে কিন্তু কখনও ভেঙ্গে পড়েন নি এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। ক্ষুব্ধ হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন কিন্তু মানুষকে ভাল ভাসতে ভোলেন নি। এমন সহজ, সরল নিরহংকারী মানুষ জগতে বিরল। "তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অকৃপণ ভাবে দান করেছিলেন দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য। এতেই ছিল তাঁর মহত্ত্বের মহামন্ত্র।"

শিক্ষা বিস্তারে প্রফুল্লচন্দ্র

শিক্ষা বিস্তারে প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান অপরিমেয়। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি সারাজীবন অর্থ সাহায্য করেছেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি পনের বছর বিজ্ঞান কলেজে কাজ করেছিলেন। সেই সময় তিনি কোন অর্থ গ্রহণ করেন নি। তাঁর প্রাপ্য অর্থ বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে ব্যয় করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে তিনি ছাত্রদের গবেষণা বৃত্তির জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন।

নিজের গ্রামে স্কুলের উন্নতির জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। কয়েক হাজার টাকা তিনি স্কুলটিকে দিয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্যে সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং তাদের জন্যে সব রকম ত্যাগ স্বীকার করতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের আরম্ভ কাল থেকে তিনি যুক্ত ছিলেন। অবশ্য বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের ভার নিতে অস্বীকার করেছিলেন বাংলার কথা ভেবে। বাংলায় শিক্ষার প্রসারের জন্যে এবং সর্বপ্রকার উন্নতির জন্যে প্রফুল্লচন্দ্র আন্তরিক দরদের সঙ্গে কাজ করতেন। বাংলাকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন।

বাগের হাটে যে কলেজ স্থাপিত হয়েছিল তার মূলে ছিলেন প্রফুল্ল-চন্দ্র। কলেজ স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া ছাড়াও তিনি অনেক অর্থ সাহায্য করেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্যে আমন্ত্রিত হতেন। ঢাকা, এলাহবাদ, নাগপুর, মাদ্রাজ, বরোদা, আলিগড়, লাহোর, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এইসব স্থানে যাতায়াতের জন্যে তিনি কোন খরচ নিতেন না। বাঙ্গালোর বিজ্ঞান কলেজের জন্যে তার দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। আর বাংলার বিজ্ঞান কলেজের জন্যে তিনি সাধ্যাতীত করেছেন।

ছাত্রেরা যাতে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত হয়ে ওঠে সে জন্যে সচেষ্ট ছিলেন। ছাত্রদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করেন নি। ছাত্রদের নৈতিক মান উন্নত করবার কথা বারে বারে বলেছেন। নৈতিক চরিত্র উন্নত না হলে উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও দেশের ও দশের কোন উন্নতি হয় না। ছাত্রদের বিড়ি-সিগারেট খাওয়া ও সিনেমা দেখা তিনি পছন্দ করতেন না। ছাত্রদের এই অপব্যয়ের বিরুদ্ধে তিনি নানা বক্তৃতায় ও নানা প্রবন্ধে বলেছেন। সুরমা উপত্যকা ছাত্র সম্মিলনীতে বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "...ডিগ্রী উন্নতির পরিচায়ক নহে।" এই বক্তৃতায় তিনি বলেছেন—"এই পুঁথিগত বিদ্যাই সর্বনাশের মূল, শিক্ষার এরূপ প্রথায় এক প্রকার ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। ছাত্র কি, শিক্ষক কি, আমি তাহা জানি না। When I ceased to be a student. তাও আমি বলিতে পারি না। পুঁথিগত বিদ্যাই যে বিদ্যা তা ভাববার কোন কারণ নাই। ....cleanliness is next to godliness; শ্রমবিমুখতা আমাদের সর্বনাশের মূল। মানুষের মত হও, নিজেরা সব করে নিতে শেখ, শ্রমবিমুখতা ছাড়। শুধু ডিগ্রী লাভ করলেই হবে না। নৈতিক চরিত্র উন্নত করতে হবে, বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ হতে হবে এবং সাবলম্বী হতে হবে। স্কুল কলেজে পড়বার থেকেও এগুলি বেশি শিক্ষণীয়। এই শিক্ষণীয় বিষয়গুলির প্রতি তিনি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নিজের গ্রামের ছাত্রদের যে উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন তা সকল ছাত্র সমাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই উপদেশটি তিনি দিয়েছিলেন ১৩৩৪ সালে। তিনি বলেছিলেন—"শুধু কতকগুলি কেতাব মুখস্থ করলেই বিদ্যা হয় না। আকবর লেখাপড়া জানতেন না; শিবাজী মহারাজ লেখাপড়া জানতেন না; রণজিৎ সিংহও নয়। মানুষ হওয়া চাই। জ্ঞানের জন্য বাজে বই অর্থাৎ পাঠ্য তালিকাভুক্ত পুস্তক ভিন্ন অন্য বই পড়। যারা আপন চেষ্টার বলে মানুষ হয় তারাই মানুষ, পুরুষকার আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আমার মনের দৃঢ়তা, আমার

একনিষ্ঠতা, আমার অধ্যবসায়, উদ্যোগ শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। আমার সফলতা বা নিষ্ফলতার জন্য অপর কেহই দায়ী নহে—আমি নিজেই দায়ী। নিজের জীবনযাত্রাকে সফল করিতে হইলে নিজের পথ দেখিয়া লইতে হইবে।

আমার শেষ সময় উপস্থিত—হে আমার সাধের ছাত্রগণ, তোমাদের দিকে আগ্রহাকুল নয়নে আমি তাকিয়ে আছি। যদি দেখি তোমরা মানুষ হচ্ছ তবে ভাববো আমার জীবনব্রত সফল হল। The feature distiny of my country is in the hands of my young children—তোমরা মানুষ হও—নিজেরা আপন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও—দেশ আবার নিশ্চয়ই উঠবে।"

শিক্ষার প্রসারে কেতাবী শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। তাই শিক্ষাবিস্তারের নানা পথে তিনি বিচরণ করেছেন। প্রকৃত শিক্ষার প্রসার ঘটলে তবেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়। শিক্ষার বিস্তার বলতে সাধারণত সকলে কেতাবী শিক্ষাকেই বুঝে থাকে না কেতাবী শিক্ষার বাইরে নানাদিকে নানাপথে শিক্ষা বিস্তারেরর কথা প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন। শ্রমের মর্যাদাবোধ স্বাবলম্বী হওয়া, মানুষ হওয়া, নৈতিক চরিত্র উন্নত করা, একনিষ্ঠতা নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি শিক্ষার বিভিন্ন দিকের প্রতি ছাত্রদের আগ্রহান্বিত হতে উৎসাহিত করেছেন।

শিক্ষা বিস্তারে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্নটিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন! বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতবাসীর স্থান নির্ণয় প্রবন্ধে বলেছেন—"জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া আমরা জাতি সংগঠন কার্যে কিছুতেই যশ লাভ করিতে পারিব না। চারিদিকের শক্তিমূলক সভ্যতার জাগরণের মধ্যে আমরা কি নিষ্ক্রিয় হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারিব—না ঐ শক্তির কঠোর পেষণে লুপ্ত হইয়া যাইব? শক্তিহীন দুর্বল জাতিকে কে কবে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে। আজ যদি ভারতবাসী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বলীয়ান হইয়া জগতের নিকট পরিচিত হইতে পারিত, তাহা হইলে আজ এই হীনতার দৈন্য তাহাকে বহন করিতে হইত না। পৃথিবীর

সমগ্র সভ্যজাতি তাহাদিগকে তাহাদের জাতীয় সম্মিলনে সসম্মানে আহ্বান করিত।"

প্রফুল্লচন্দ্র সরল ও সাদাসিধে মানুষ হলেও তেজস্বী ছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ে সমকালীন যুগের মন্ত্রিসভা যে ছেলেখেলা শুরু করেছিল তার তীব্র প্রতিবাদ তিনি করেছিলেন বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল প্রবন্ধে। তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেছেন—"...বাঙ্গালার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল আইন সভায় নূতন এক মাধ্যমিক শিক্ষাবিল উপস্থিত করেছেন। এই প্রস্তাবিত বিলের যথারীতি ও যথাযোগ্য বিচারালোচনার সুযোগ দিতে তাঁরা অনিচ্ছুক; প্রত্যেক বিশিষ্ট আইন প্রবর্তিত হবার আগে সিলেক্ট কমিটিতে আলোচিত ও বিচারিত হবার যে সাধারণ রীতি প্রচলিত আছে, বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল এই ব্যাপারে তা পালন করছেন না। সরাসরি বিলটিকে সংখ্যাধিক্যের জোরে আইনসভায় পাশ করিয়ে যথাসম্ভব তাকে বিধি বদ্ধ করে নিতে পারলেই যেন তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলে মনে হচ্ছে; ১৯৪০-এ এক মাধ্যমিক শিক্ষা আইনে প্রস্তাব আইন সভায় উপস্থিত করা হয়েছিল; সেই শিক্ষা বিরোধী, প্রগতি বিরোধী প্রস্তাব দেশে যে ক্ষুব্ধ আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল তা এখনও সকলের স্মৃতিতে জাগরুক। ...সেই ক্ষোভ ও বিরোধের ফলেই গভর্ণমেণ্ট তখনকার মত প্রস্তাবটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৪১-এ বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডল নবগঠিত হয়, এবং এক বৎসরের মধ্যেই তাঁরা সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সকল মতামতের দিকে দৃষ্টি রেখে ১৯৪২-এ একটি সুচিন্তিত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিকল্পনার প্রস্তাব প্রণয়ন করেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় সেই প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হতে পারে নি। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল শাসনভার হাতে নিয়েই ১৯৪২-এর প্রস্তাবটি নূতন একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করে তাকে নূতন রূপ দিতে চেষ্টা করেন। এই সিলেক্ট কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যরা আইনগত আপত্তি উত্থাপিত করে বলেন—

১৯৪২-এর প্রস্তাবিত বিলের মূলগত আদর্শ স্বীকার করে না নিলে বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের সেই বিলের প্রস্তাব উত্থাপন ও বিধিবদ্ধ করবার কোনও অধিকার নেই। তারই ফলে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল ১৯৪৪-এর এই নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন এবং জনসাধারণকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন যে, এই প্রস্তাব যথার্থতঃ ১৯৪২-এরই পুরানো প্রস্তাব শুধু একটু আধটু অদলবদল করা হয়েছে মাত্র। অথচ সত্য বলতে গেলে পুরাতন প্রস্তাবের সঙ্গে নূতন প্রস্তাবের আদর্শগত কোথাও কোনও মিল নেই। তাছাড়া গঠন এবং নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে নূতন প্রস্তাবে এত রদবদল করা হয়েছে যে, এই প্রস্তাব ১৯৪২-এর প্রস্তাবের চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতিকর শিক্ষাবিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াশীল। এ প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হলে শুধু যে বাঙ্গালার মাধ্যমিক শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হবে, তাই নয়, বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে মূল শিথিল হয়ে পড়বে, এমন আশঙ্কা এতটুকু অমূলক নয়।"

শিক্ষা বিস্তারে যে প্রগতির অন্তরায়, যা ক্ষতিকর তার বিরোধিতা তিনি করেছেন অন্যের বিরাগভাজন হয়েও। শিক্ষার ব্যাপারে তিনি কোন কিছুর সঙ্গে আপোস করেন নি। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সুষ্ঠু শিক্ষানীতি প্রবর্তনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এমন প্রগতিশীল শিক্ষাব্রতী আমাদের দেশে বিরল। প্রফুল্লচন্দ্র জানতেন শিক্ষা জাতি গঠনের সহায়ক, শিক্ষাই সভ্যতার অগ্রগতি ঘটায়, শিক্ষায় মানুষকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দেয় এবং দেশের ও দশের কল্যাণসাধন করে। সেই জন্যে তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সার্বিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সকল প্রকার শিক্ষা বিস্তারে এবং শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। যুগের অন্যান্য মানুষদের তুলনায় তাঁর চিন্তাধারা ছিল প্রগতিশীল। শিক্ষা যাঁর ধ্যান-জ্ঞান সেই মানুষ প্রগতির পরিপন্থী কোন কিছুকে বরদাস্ত

করেন নি। অন্যের বিরাগভাজন হয়ে প্রগতির পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রগতিশীল চিন্তার শরিক বলে আমরা তাঁর কাছে চিরঋণী। তাঁর মত ও পথ পরবর্তীকালে স্বীকৃতি পেলেও আজো তাঁর চিন্তাধারার সম্পূর্ণ ও সার্থক রূপ বাস্তবায়িত হয় নি। উত্তরকালে প্রগতিশীল চিন্তাধারার শরিকদের আচার্যের আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর চিন্তাধারাকে সার্থক করে তুলবার দায়িত্ব বহন করতে হবে। সেটাই হবে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

বাঙালীকে ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ হবার আহ্বান

প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষাব্রতী ও বিজ্ঞানসাধক হলেও ব্যবসার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল। সেই জন্যে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অন্যকে ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছে। বাঙালীকে কর্মঠ হতে এবং ব্যবসায়ে নামতে সারাজীবন চেষ্টা করেছেন। কোন বাঙালী ব্যবসায়ে উন্নতি করেছে শুনলে আনন্দিত হতেন। বহু বাঙালীকে তিনি ব্যবসার জন্যে অর্থ সাহায্য করেছেন। অনেকের কাছ থেকে প্রতারিত হয়েছেন তবু ব্যবসার জন্যে অর্থ চাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করতেন। কারো কারো জন্যে ব্যাঙ্কের জামিন হয়ে দেনা শোধ করেছেন! শোনা যায় বাঙালীকে ব্যবসায়ে নামাতে প্রায় দশ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন।

তাঁর কাছে কেউ চাকরীর জন্যে গেলে তাকে তিনি ব্যবসা করতে বলতেন। ব্যবসা করবার মত অর্থ নেই শুনলে অর্থ ও পরামর্শ দিতেন। এই ভাবে কত মানুষকে যে তিনি ব্যবসায়ী করে তুলেছেন তার সঠিক কোন হিসেব নেই। এ ব্যাপারে তাঁকে নিয়ে অনেক গল্পকথা বাজারে প্রচলিত আছে। একবার একজন তাঁর কাছে চাকরীর জন্যে গেলে তিনি তাকে একটাকা দিয়ে আলুর ব্যবসা করতে বলেন। সেই ব্যক্তি আলুর ব্যবসা শুরু করে ক্রমে ক্রমে উন্নতি করে। প্রফুল্লচন্দ্র তখন তাকে আরও কিছু টাকা দেন। এই ভাবে সে ক্রমে ক্রমে বড় ব্যবসায়ী হয়ে উঠে। ব্যবসায়ে উন্নতি করলেও সেই ব্যক্তি প্রফুল্লচন্দ্রের দান চিরকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতেন। তাকে ব্যবসায়ে নামার ও বড় হবার জন্যে যে অর্থ প্রফুল্লচন্দ্র দিয়েছিলেন সেই অর্থ ফেরৎ দিতে গেলে তিনি অর্থ নেন নি। এইভাবে তিনি আর একজন মানুষকে সামান্য পয়সা দিয়ে বলেছেন নিমের দাঁতন বিক্রি করতে। নিমের দাঁতন বিক্রি করে লাভের পয়সা প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে জমা রাখতেন। কিছুদিন পর

সেই জমা কিছু টাকার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করে তাকে কম্বল কিনে দিয়ে কম্বলের ব্যবসা করতে বললেন। কালেক্রমে সেই ব্যক্তি একজন বড় কাপড়ের ব্যবসায়ী হয়ে উঠে। উৎপাদন প্রথা ভিত্তিক ব্যবসায়েও তিনি অনেককে অর্থ সাহায্য করেছেন। কেউ উন্নতি করেছে আবার কেউ বিফল হয়েছে। হতাশ না হয়ে সকলকেই তিনি নিরলস কর্মকরে যেতে বলতেন। 'বাঙালী যুবকের শ্রম বিমুখতা' প্রবন্ধে বলেছেন—"হায় বাঙালী যুবক, তথাকথিত বিদ্যার্জনের দোহাই দিয়া তুমি অর্থনীতি ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছ এবং কেবল পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছ।"

বাঙালীকে তিনি ব্যবসায়ী হতে বলেছেন। বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছেন—"ডিগ্রীর মোহ আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। জ্ঞান অর্জন হইতেছে না, ডিগ্রী অর্জিত হইতেছে।...ফাঁকি দিয়া পাশ করাই এখনকার ছেলেদের উদ্দেশ্য। এই জন্যই ভারতবর্ষীয়দের আমি বলিয়া থাকি **Degree is only a clock to hide one's ignorance** অর্থাৎ ডিগ্রী অজ্ঞতা ঢাকিবার আবরণ মাত্র।......কেবল চাকরির আশায় তাহারই পথ পানে চাহিয়া হা-ভাতের মত বাঙালীর দিন যাইতেছে। তাহার কর্মে স্পৃহা নাই, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। অন্নাভাবে তাহার তনু ক্ষীণ।" বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে তারা ব্যবসা করে উন্নতিলাভ করেছে। তারা যদি পারে বাঙ্গালী পারবে না কেন? লেখাপড়া শিখেও ব্যবসা করা চলে। আবার সামান্য জ্ঞান নিয়েও ব্যবসা করা চলে। তবে পরিশ্রম করতে হবে। পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকার চিন্তা ছাড়তে হবে। বিভিন্ন লেখায়, বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি একই কথা বারে বারে বলেছেন।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর বেকার সমস্যা প্রবন্ধে বলেছেন—"গত ৫০ বছর ধরিয়া আমি বিজ্ঞান চর্চা করিয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু শুধু একটি বিষয়ে আলোচনা করিয়াই আমি সন্তুষ্ট থাকি না। বাঙ্গালী জাতি যে

ব্যবসা ক্ষেত্রে সকলের পিছনে পড়িয়া যাইতেছিল, তাহা আমি আমার যৌবন কাল হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। সেজন্য কলেজে শিক্ষকতা করার সঙ্গে সঙ্গে আমি নানাবিধ ক্ষেত্রে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম।......তথা কথিত উচ্চশিক্ষা যে আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, আজও আমরা সে কথা চিন্তা করি না। যে উচ্চশিক্ষা দেশের বেকার সমস্যার সমাধানের উপায় নির্ণয় করিতে পারে না, অধিকন্তু দেশের সহস্র সহস্র শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি করে, সেই শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করা কি আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না? বি. এ, এম. এ, পাশ করা ছেলের দল বেকার অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন প্রকারে তাহারা জীবিকা অর্জনে সমর্থ হইতেছে না। অথচ এ অবস্থায় ভিন্ন প্রদেশবাসী অশিক্ষিত লোকগণ বাংলায় আসিয়া অর্থোপার্জনও করিতেছেই—তাহার উপর অচিরকাল মধ্যে বিরাট ধনী হইয়া উঠিতেছে। বাংলার যুবক সম্প্রদায় এ সকল দেখিয়াও দেখেন না। তাঁহারা সেই মামুলী চাকরীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।"

শ্রমবিমুখ ও ব্যবসাবিমুখ বাঙ্গালীকে তিনি কত প্রকারে উৎসাহিত করেছেন। চোখের সামনে অন্য প্রদেশের মানুষ স্বল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করে ধনী হচ্ছে আর বাঙ্গালী চুপচাপ বসে তাই দেখছে এবং তাদের দুয়ারে চাকরির জন্যে ধর্ণা দিচ্ছে। যেসব ব্যবসা বাঙ্গালী নিজেই করতে পারে বা তার পক্ষে করার সুবিধা সেসব ব্যবসাতেও বাঙ্গালী পিছিয়ে পড়ছে। এইসব ব্যাপার তাঁর বুকে বড় বাজত। উদাহরণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন বাগের হাট ও বরিশাল অঞ্চলের বারুজীবী সম্প্রদায় পানের ব্যবসার সঙ্গে সুপারির ব্যবসাও করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা বাড়িঘর ছেড়ে বিদেশে যেতে চায় না। অথচ তাদের বাড়ির দুয়ার থেকে বিদেশী অশিক্ষিত ব্যাপারীরা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে। বাঙ্গালীর ধ্বংসের কারণ প্রবন্ধে বলেছেন— "প্রায় ৩১ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার শীর্ষক

একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বাঙালীর অক্ষমতা শ্রমবিমুখতা এবং নিশ্চেষ্টতার কথা উল্লেখ করিয়াছি.........৩০ বৎসরেরও আগে যাহা লিখিয়াছিলাম আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হইতেছে। আমাদের উচ্চ শিক্ষাভিমানী যুবকবৃন্দ যাঁহারা political Economics বা অর্থনীতি-মূলক বিদ্যা অধিগত করিয়াছেন তাহাদের মুখে কেবলই শুনা যায় মাড়োয়ারী মাত্র middle man ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, কেবল মাড়োয়ারী নয়—ভাটিয়া, গুজরাটী, কচ্ছ অঞ্চলের মেমনগণ এবং বোম্বাই-এর বোরা বা মোজা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়িগণ কেবল middle man হইয়া এই বাঙ্গলাদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ কেন, কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে।"

পাটের ব্যবসায়, কাপড়ের ব্যবসায় বাঙ্গালী ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। অথচ এইসব ব্যবসা বাঙালীর একচেটিয়া হওয়ার কথা।

এমনকি কোন কোন অঞ্চলে ধানকল, চালকল, সরিষা, কলাই প্রভৃতির ব্যবসাতেও বাঙালী পিছিয়ে পড়ছে। অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা এইসব ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। এর কারণ কি? এর কারণ হিসেবে বলেছেন উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হয় না। আর যাদের বাপ-ঠাকুর্দা ব্যবসা করে বেশ কিছু অর্থ রেখে গেছেন বংশধরগণ সেই অর্থ বিলাস ব্যসনে ব্যয় করে দারিদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পিতৃপুরুষের ব্যবসা না করে বিলাসিতা করে বেড়ায়। তিনি বলেছেন—"হায় বাঙ্গালী! আজও তোমার চোখ ফুটিল না। কখনও তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া ছুটিতেছে। .... আবার এদিকে আয় যত কমিতেছে, বিলাসিতা ঠিক তত বাড়িতেছে। এক সিনেমায় প্রতিদিন কত টাকা বাঙ্গালী—বিশেষতঃ যুবক ছাত্রগণ অপব্যয় করিতেছে। এই সব সিনেমা বাতিক জাতির সর্বনাশ করিতে উদ্যত। ইহাতে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী; আবার পাড়ায় পাড়ায় হেয়ার কাটিং সেলুন, ডাইং ক্লিনিং রেস্তোরাঁ দিন দিন গজাইতেছে। বস্তুতঃ আমার এই জীবন সন্ধ্যায়

স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই জাতি যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে যে, অতলস্পর্শী ধ্বংস সাগরে ঝাঁপ দিবেই।”

স্টেশনে ও খেয়াঘাটে যত কুলী দেখা যায় প্রায় সমস্ত অবাঙ্গালী। প্রফুল্লচন্দ্রের মতে এ কাজ বাঙ্গালী যুবকেরা অনায়াসেই করতে পারে। ইজ্জৎ যাওয়ার ভয়ে তারা মুটের কাজ করে না। প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন—“অথচ এই সকল স্থানের চতুস্পার্শে বাঙ্গালী কৃষকগণ বসতি করিতেছে। তাহারা ঋণে জর্জরিত—কখনও বা অনশনে, কখনও বা অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে, বাড়ির সন্নিকটে উপার্জনের ক্ষেত্র আছে। তবুও ইজ্জৎ যাইবার ভয়ে কেহ মুটের কাজ করিবে না। এ জাতির উপায় কি?”

প্রফুল্লচন্দ্র বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং তাঁর আত্মচরিতে দেখিয়েছেন বাংলা থেকে কত টাকা প্রতি মাসে বাংলার বাইরে যায়। তিনি দেখিয়েছিলেন (১৯৩০-এ) প্রতিমাসে দশ কোটি এবং বছরে ১২০ কোটি বাংলা থেকে বাংলার বাইরে যায়। প্রফুল্লচন্দ্রের হিসেব ১৯৩১-এর আদিম সুমারিতে স্বীকৃত হয়েছিল। “অন্ন সমস্যায় যে বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর সহিত প্রতিযোগিতায় দিনদিন হটিয়া যাইতেছে, ইহার প্রধান কারণ এই—অলসতা ও শ্রমবিমুখতা বাঙ্গালীর যেন অস্থিমজ্জাগত। আমি প্রায়ই বলিয়া থাকি, অর্থনীতিক হিসাবে বাঙ্গালী যে মাড়োয়ারী দ্বারা পরাজিত হইয়াছে—তাহার প্রধান কারণ এই অলসতা ও দীর্ঘসূত্রতা।”

শিল্প ব্যবসায়ে যে সমস্ত বাঙ্গালী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র। এইসব শিল্প ব্যবসায়ীদের কর্মবীর বলতেও দ্বিধা করেন নি। প্রফুল্লচন্দ্রের বিভিন্ন উক্তি থেকে কেউ যেন মনে না করেন। তিনি ভিন্ন প্রদেশবাসীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। কারো প্রতি কোন বিদ্বেষ তাঁর ছিল না। তুলনামূলক বিচার করে বাঙ্গালী যুবকদের তিনি ব্যবাসার প্রতি উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। কোনরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব তাঁর ছিল না। আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতাকে মনে স্থান দেন নি। বরং ভিন্ন প্রদেশবাসীর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের তিনি প্রশংসা করতেন। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

শিক্ষা বিস্তারে, ছাত্রদের সুবিধার্থে গবেষণা বৃত্তি প্রবর্তনে, ছাত্রদের নানাবিধ উপকার সাধনে, আদর্শ ও কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়ার আহ্বানে, বিজ্ঞান সাধনায় ব্রতী হওয়ার, ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বানে এবং দুঃস্থ মানুষদের আর্থিক সাহায্য দানের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রের মানব সেবার আদর্শ ও মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ কারণে দেশের মানুষ চরম দুর্গতির মধ্যে পতিত হলে তাদের ত্রাণের জন্যেও প্রফুল্লচন্দ্র কারো অপেক্ষা না করেই এগিয়ে এসেছিলেন।

১৯২১ সালে যখন খুলনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন প্রফুল্লচন্দ্র দুর্গত মানুষদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। ইংরেজ সরকার এবং তার বেতনভুখ কর্মচারীরা খুলনার দুর্ভিক্ষের কথা অস্বীকার করে-ছিল। এ খবর জানতে পেরেই প্রফুল্লচন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। দেশের হাজার হাজার মানুষ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দুর্গতদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রফুল্লচন্দ্রের আহ্বানে এত মানুষ সাড়া দিয়েছিল যা অপ্রত্যাশিত ছিল। হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য এল। অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক কাজ করবার জন্যে এগিয়ে এল। সকলের সমবেত চেষ্টায় দুর্ভিক্ষের পাড়িত মানুষ ক্ষুধার হাত থেকে মুক্তি পেল প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে এই কাজ সম্ভব হয়েছিল।

১৯২৩ সালে উত্তরবঙ্গে বন্যা দেখা দিল। উত্তরবঙ্গের বন্যার সময় প্রফুল্লচন্দ্র সকলের আগে ত্রাণ কার্যে এগিয়ে এলেন। এবার তাঁর আহ্বানে অসংখ্য মানুষ সাড়া দিল। বাংলার মানুষ অর্থ ও জামা-কাপড় সংগ্রহ করে দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করে। প্রতিদিন খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে নানাবিধ সাহায্য এল। অনেকে বলেন প্রফুল্লচন্দ্রের আহ্বানকে মানুষ দেবতার

আহ্বান মনে করেছিল। তাঁর সংগঠনী শক্তি ছিল অসাধারণ। আর কর্মতৎপরতায় ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর অসাধারণ সংগঠনী শক্তি, কর্মতৎপরতা ও নেতৃত্বের রূপ দেখে দেশবাসী যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছিল। গান্ধীজী তাঁকে Doctor of Floods বলে অভিহিত করতেন।

যখনই মানুষ কোন কারণে বিপন্ন হয়ে পড়তো তখনই প্রফুল্লচন্দ্র ত্রাণ ও উদ্ধারের কার্যে এগিয়ে আসতেন। বয়েস হলেও যুবকদের থেকে তিনি বেশি কর্ম তৎপর ছিলেন। ৪৩-এর দুর্ভিক্ষেও তিনি অনেক অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তখন তিনি বৃদ্ধ। নেতৃত্ব দেওয়ার এবং ত্রাণ সংগঠন গড়ে তুলবার বয়েস ছিল না। তাই অর্থ সাহায্য দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। মানব সেবায় তাঁর আন্তরিকতা চিরদিন দেশবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

দেশের দরিদ্র মানুষের জন্যে তিনি কতটা ভাবতেন তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতায়। 'দেশের কর্তব্য ও সেবা সম্বন্ধে দুটো কথা' প্রবন্ধে বলেছেন—"যদি দেশকে সম্যক বুঝিতে চান, তবে সহরের দুচারটা বাড়ী দেখলেই চলবে না। জাতি মেরুদণ্ড, জাতির শক্তি, জাতির প্রাণ, পল্লীর ও নিরক্ষর চাষীদের দিকে তাকান। উচ্চ-শ্রেণীর শিক্ষিত লোক কয়টি? বাংলাদেশের লোকসংখ্যা এখন সাড়ে চার কোটির উপর। দেশের শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর তাদের বাদ দিলে ত কিছুই থাকে না। সুতরাং তাদের আগে চাই। কথায় বলে —A nation lives in huts. কুটীর ফেলে গেলে চলবে না। শিক্ষিত আমরা, আমাদের উচিত আমাদের অজ্ঞ ভাইদের জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তারা রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে, অনাহারে প্রপীড়িত হয়ে মরতে বসেছে, এখন কি আমাদের নিজ নিজ সুখ ভোগে মত্ত হওয়া সাজে? আমাদের কর্তব্য যারা পশ্চাৎপদ তাদের সকলকে হাত ধরে টেনে তোলা, তাদের সকলকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করা। এখনও বাংলাদেশ শিক্ষিত বাবুদের কথা শোনে, পরে আর শুনবে বলে

বোধ হয় না। ভাই বলে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে, তারা যে আমাদের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা, তাদের শিরায় ও ধমনীতে আমাদেরই রক্ত প্রবাহিত।"

আন্দুল সেবা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে 'শিক্ষা ও সেবা' বক্তৃতায় বলেছেন—"সেবার কথা উঠলেই আমাদের সময়কার ছাত্র-জীবনের কথা মনে পড়ে। এখনকার ছেলেরা সেবা বিষয়ে তখনকার ছেলেদের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর। আমাদের সময় দেখেছি যদি কোন ছাত্র ছাত্রাবাসে বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হত তবে সকল ছাত্র তাকে ত্যাগ করত, কিম্বা মেথর-মুদ্দফরাসের জিম্মায় তাকে হাসপাতালে বাস করতে হত। আর এখনকার ছাত্রেরা পীড়িতের সেবার্থে পালা করে রাত্রি যাপন করে, বন্যাপীড়িত দুঃস্থ নরনারীর সেবায় প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করতে শিখেছে। এসব দৃশ্য দেখলে সত্যই প্রাণে কেমন একটা আনন্দ হয়। সেইসব সেবাপরায়ণ ছাত্রদের দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে ইচ্ছা হয়।

আজকাল একটা সুর উঠেছে ইউরোপের যা কিছু সবই পরিত্যজ্য। একথাটা একটু তলিয়ে দেখলেই আমাদের ভুলটা ধরা পড়ে তাদের মধ্যে অনেক সৎকাজ দেখতে পাই যা আমাদের সর্বতোভাবে শিক্ষা করা উচিত। এক লণ্ডন সহরে ৬০।৭০টি হাসপাতাল আছে; সবগুলিই দেশের স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আমাদের দেশে স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত একটিও হাসপাতাল বা সেবাশ্রম নাই, বললেও অত্যুক্তি হয় না। ...এরূপে নিঃস্বার্থভাবে অর্থ দান করতে আমরা কয়জন শিখেছি আর কয়জনই বা মানব সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে শিখেছি। বিবেকানন্দ ঠিক বলেছিলেন—আমাদের এমন একদল স্বেচ্ছাসেবক দরকার যারা আত্মসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাণ ভরে সকলের ও দেশের সেবা করবে। শ্বেতাঙ্গরা জড়বাদী হোক, কিন্তু তাদের কাছে শেখবার অনেক জিনিষ আছে। মানুষ যদি মানুষকে প্রেম বন্ধনে না বাঁধল; যদি তার সেবা করে ধন্য না হল—তবে

শুধু প্রাণহীন আধ্যাত্মিকতার আলোচনায় ফল কি ?”

মানব সেবা সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্রের আন্তরিকতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে উক্তিগুলির মধ্যে। মুখের কথা দিয়েই তিনি কাজ শেষ করেন নি। ব্যক্তিগতভাবে সেবা কার্যে আত্মনিয়োগ করেছেন। অন্যের থেকে এইখানেই প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য। তাঁর ছাত্র-জীবন কালের তুলনায় পরবর্তী কালের ছাত্ররা যে সেবা কার্যে ব্রতী হয়েছে তা দেখে তিনি খুসী হয়েছেন। আমাদের দেশে ইংরেজ শাসন করলেও ইংরেজ জাতির এবং ইউরোপের সবই খারাপ তা নয়। যার যা কিছু ভাল তার প্রশংসা করতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না।

স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে প্রফুল্লচন্দ্র পিতার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি অর্থ ও উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা। শিক্ষার আলো অন্তরে প্রবেশ না করলে মেয়েরা বাইরের মহৎ কাজে অংশ নিতে অনুপ্রাণিত হবে না। অথচ ঘরের কাজের সঙ্গে বাইরের কাজেও মেয়েদের অংশ গ্রহণ প্রয়োজন। বিভিন্ন সেবামূলক কাজে এবং জাতীয় আন্দোলনে অংশ নিতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। এইসব বিভিন্ন বিষয় অনুভব করে তিনি স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ভবানীপুরের পদ্মপুকুর চড়কমেলায় শিল্প প্রদর্শনীতে বলেছিলেন—"এই মৃত বাংলার প্রাণ সঞ্চার করিতে হইবে। আজ দেশের এই সঙ্কটে আমি মাতৃজাতিকে মৃতসঞ্জীবনী সুধা হস্তে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছি। ইংল্যাণ্ডের মহাসঙ্কট ও পরীক্ষার দিনে রমণী জাতিই আগুয়ান হইয়া আসিয়াছেন। নারী জাতির প্রেরণায় আবার আমাদের সাধনা সফল হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। ...মাতৃশক্তি জাগ্রত হইয়া দেশের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান করিবেন, ইহাই বিশ্বাস করি। তাই আজ আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাংলাদেশের শক্তি স্বরূপিণী মাতৃজাতির প্রতি আমার নিবেদন যে তাঁহারা একবার জাগ্রত হউন। নিজের গৃহে ও পরিবারে তাঁহারা প্রেরণার অমৃত উৎস সৃজন করুন।"

মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের দেশে প্রফুল্লচন্দ্রের সমকালে ছিল না। মেয়েদের অন্যের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে থাকতে হোত। গান্ধীজী যে চরকায় সুতো কাটার প্রবর্তন করেছিলেন তাকে তিনি সমর্থন করেছিলেন। মেয়েদের চরকায় সুতো কাটার

জন্যে আবেদন করেছিলেন। তিনি খুলনার এক জনসমাবেশে নারীজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন— "এখানে অনেক মালক্ষ্মীরা উপস্থিত আছেন। অবশেষে তাঁহাদের নিকট আমার করজোড়ে নিবেদন এই যে, চরকাকে তাঁহাদের গৃহস্থালীর কাজকর্মের ভিতর যেন অঙ্গীভূত করিয়া লয়েন···আমার ধারণা, প্রত্যেক পরিবারে এমন দুই একজন লোক আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রত্যহ সূতা কাটিতে পারেন। ইহাতে সংসারের অনেক উপকার হয়।······আর যদি এক ঘণ্টার বেশী সময় ঐ চরকাতে নিয়োগ করেন তাহা হইলে ঐ সমস্ত বিধবা স্ত্রীলোকেদের পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হয় না।···দেশের এই আন্দোলনে স্ত্রী জাতিরও একটি কর্তব্য আছে, সে কর্তব্য বর্তমানে কেবলমাত্র সূতাকাটা। তাই কবির কথায় বলিতে হয়—

তোরা না করিলে সাধনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রসঙ্গে

প্রফুল্লচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যও ছিলেন না। দেশের সমসাময়িক আন্দোলনগুলির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। গান্ধীজীর অনেক কিছু সমর্থন করতেন। আবার যেসব বিষয় তাঁর পছন্দ ছিল না তার বিরোধিতাও করেছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি কংগ্রেসের নীতি সমর্থন করেন নি। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের না গ্রহণ না বর্জন নীতি সমর্থন করেন নি। এই সময় তিনি Nationalist party-তে যোগ দেন। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেন নি।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রশ্নে তিনি এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, এ সম্পর্কিত জনসভায় যোগ দিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কলকাতার ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধী দিবসে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেছিলেন—"আজ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধীদিবস। এই দিনে আমাদের এক মহা অনিষ্ট সজ্ঘটিত হইয়াছিল। এই অনিষ্ট হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইবে।...সাম্প্রদায়িকতার সহিত মিলন ঘটাইয়া জাতীয়তার বিকাশ অসম্ভব, একথা লর্ড মর্লি হইতে আরম্ভ করিয়া সাইমন কমিশনের সভ্যবৃন্দ পর্যন্ত সকল ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞরাই স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি ইংরাজের স্বার্থ সিদ্ধির সুবিধা কল্পে আমাদের উপর এই উৎকট ব্যবস্থা চাপান হইয়াছে।......আমি চিরদিনই সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও প্রীতি সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। সংখ্যালঘিষ্টদের সমস্ত ন্যায় সঙ্গত দাবী সংরক্ষণের জন্য আমি সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু শ্রেণী বিশেষের ও সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে দেশের অনিষ্ট সাধনের আমি কোন-

প্রকারে সহায়তা করিতে পারি না।……দিন যতই অগ্রসর হইতেছে ততই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কুফল পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।… সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রসূত ভোটের জোরে এবং ইউরোপীয় সভ্যদের সহায়তায় এই প্রদেশে একটি তাণ্ডব লীলা চলিতেছে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সমূলে উচ্ছেদ না হইলে বাংলাদেশের কোন প্রকার উন্নতি হইবে না। পরন্তু ইহার দুর্দশা আরও বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং আমি আপনাদের নিকট এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, যতদিন এই বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহৃত না হয় ততদিন আপনারা সর্ব প্রকারে ইহার বিরোধিতা করিবেন।……বিশেষ করিয়া একদল স্বদেশবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্মিলিত অভিযান নীতির অজুহাতে এখনও ইহাতে মৌন সম্মতি দিয়া আসিতেছেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া আমি আরও দুঃখিত হইয়াছি। ভারত শাসন ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক নীতি প্রবর্তন করিবার পর হইতে জগতের চক্ষে ভারতকে হেয় করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের বিবাদ-বিসম্বাদ ঈর্ষাদ্বেষের চিত্র রচনা করিবার যে চাতুরী অবলম্বন করিয়াছে, এই সমস্ত ব্যক্তি তাঁহাদের না গ্রহণ না বর্জন নীতির দ্বারা নিশ্চিতভাবে তাহার সাহায্য ও সহযোগিতা করিতেছেন।……যদি আমরা এই অন্যায়ের সম্মুখে শির অবনত করি তাহা হইলে স্বদেশের প্রতি আমাদের কর্তব্যচ্যুতি ঘটিবে। অতএব যতদিন না তথাকথিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেশ হইতে সমূলে উৎপাটিত হয় ততদিন উহার বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে নির্মম সংগ্রাম চালানোর প্রতিজ্ঞা আমরা গ্রহণ করিতেছি।”

বাঙ্গালীর খাওয়া সম্পর্কে

খাওয়া সম্পর্কে প্রফুল্লচন্দ্রের কোনরূপ বাছ বিচার ছিল না। সাধারণ খাওয়া তিনি পছন্দ করতেন এবং খেতেন পরিমিত। বাঙালীর অন্ন সমস্যা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। সকালে-বিকালে খাওয়ার ব্যাপারে তিনি চিড়ে, মুড়ি, খই-এর পক্ষপাতী ছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতায় শিক্ষিত বাঙ্গালী এসবের পরিবর্তে বিস্কুট খেতে শুরু করে। চিড়ে, মুড়ি, খই বাঙ্গালীর নিজস্ব। বিস্কুট বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে। তাছাড়া বিস্কুট কারখানার মালিক বিদেশী। বিস্কুট খেলে লাভ বিদেশীদের। চিড়ে, মুড়ি, খই-এর কদর শিক্ষিত বাঙালীর কাছে কমে যাওয়ায় তিনি মর্মাহত হন। বাধ্য হয়ে তিনি চিড়ে, মুড়ি, খই-এর উপকারিতা সম্বন্ধে বলতে ও লিখতে শুরু করেন।

শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিবারের এমনই অবস্থা যে কোন আগন্তককে মুড়ি, চিড়ে দিলে সেভাবে তাকে উপযুক্ত সমাদর করা হলো না। আর যার বাড়িতে আগন্তুক এসেছে সেই বাড়ির কর্তা গৃহিণী চিড়ে, মুড়ি দিতে লজ্জা বোধ করেন। জাতীয় চরিত্রের এই শোচনীয় দুর্বলতা দেখে প্রফুল্ল স্বয়ং চিড়ে, মুড়ি, খই-এর পক্ষে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন —"ভিটামিন বি (২) মানুষের সর্বাঙ্গীন সুস্থতার জন্য অপরিহার্য্য এবং এই উভয়বিধ উপকারী ভাইটামিনই চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি সামগ্রীতে বিস্কুটের অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। ....চিড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি সামগ্রীতেও প্রোটিনের পরিমাণ চাউলের প্রোটিনের পরিমাণের মতই পাওয়া যায়।

নিম্নের তালিকায় চিড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুটের পরীক্ষার ফল প্রদত্ত হইল :—

প্রতি ১০০ গ্রাম (৯ তোলা) দ্রব্যে কত ইউনিট			প্রতি ১০০ অংশ কত অংশ
	ভাইটামিন বি ১	ভাইটামিন বি ২	ডেকষ্ট্রিন
লাল চিড়া (কাঁচা)	৩৪'৫	১৮'৫	১'৫
„ (ভাজা)	৩৪'৪	৭'৫	৪'১
সাদা চিড়া (কাঁচা)	২২'৫	১২'৫	১'৭
„ (ভাজা)	১৮'৫	৭'৫	২'৮
মুড়ি	১৪'৫	১১'০	৬'১
খই	১৩'০	১৪'০	৫'৭
বিস্কুট	১২'০	১১'১	১'৯

উল্লিখিত তালিকাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি-চিঁড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি প্রত্যেক সামগ্রীতেই বিস্কুট অপেক্ষা ভাইটামিন বি ১ বেশী আছে। খই এবং কাঁচা চিঁড়াতে ভাইটামিন বি ২ বিস্কুটের চেয়ে বেশী এবং মুড়ি খইও ভাজা চিঁড়াতে বিস্কুট অপেক্ষা অনেক বেশী ডেকষ্ট্রিন বিদ্যমান। ঈষৎ ভাজা চিঁড়া মুখরোচক, উহাতে ডেকষ্ট্রিনের পরিমাণও বেশী, অথচ উহাতে ভাইটামিনেরও বেশী অপচয় হয় না।”

চিড়ে, মুড়ি, খই দামেও সস্তা এবং অল্পে পেট ভরে। এগুলির সঙ্গে শসা, নারকেল, গুড় খেলে তা উপকারী। প্রফুল্লচন্দ্র ভিজান ছোলা মুগের অঙ্কুর, শাঁকআলু ও গুড়কে আদর্শ জলখাবার হিসেবে অভিহিত করেছেন। শসা, আম, জাম কাঁঠাল, পেঁয়ারা, আতা, পেঁপে, লেবু প্রভৃতি খাওয়ারও উপদেশ দিয়েছেন। এসব খেলে জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে বলে তিনি মনে করেছেন। উক্ত প্রবন্ধের পরিশেষে বলেছেন— “খাদ্য হিসাবে বিস্কুটের স্থান কোথায় তাহাও আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইলাম। আশাকরি, বাঙ্গলার নব্য গৃহলক্ষ্মীগণ তাঁহাদের মাতা, মাতামহীর আদর্শ অনুকরণ করতঃ চিঁড়া, মুড়ি, খই প্রস্তুত তাহা পরিবেশন করিয়া স্বাস্থ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবেন এবং সর্বনাশী চা বিস্কুটকে কদাচ ত্রিসীমানায় আসিতে দিবেন না।”

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সহরের শিক্ষিত মানুষ আজো প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশ গ্রহণ করে নি। গ্রামে চিরকালই চিড়ে, মুড়ি, খই-এর কদর ছিল এবং এখনো আছে। কিন্তু এসবের তেমন কদর নেই। তদুপরি বিলাসিতার স্রোতে বাঙ্গালী গা ভাসিয়ে দিয়ে চা বিস্কুট, চপ, কাটলেট, মোগলাইপরটা, কেক প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এসব না খেলে নাকি শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মান নষ্ট হয়। পরিতাপের বিষয় প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ আমরা গ্রহণ না করে স্বাস্থ্যের সর্বনাশ ঘটাতে চলেছি।

বাঙালীর ভবিষ্যৎ চিন্তা

প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিভোর ছিলেন। কিরূপে, কোন্ উপায়ে বাঙ্গালী আবার অন্ধকার থেকে আলোয় আসবে সেই চিন্তা নিরন্তর তাঁকে কুরে কুরে খেত। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে দেখেছেন বাঙ্গালী কিভাবে অর্থনৈতিক জগৎ থেকে পিছু হটছে। অন্ন সমস্যা ক্রমশ প্রকট আকার ধারণ করছে। ব্যবসা বাণিজ্যে ভিন্ন প্রদেশের মানুষ এসে জাঁকিয়ে বসেছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন জাতি বা রাজ্য পিছিয়ে পড়লে তার বৈষয়িক উন্নতি কখনই সম্ভব হয় না। ক্রমেই সে পিছু হঠতে থাকে। নানাবিধ সমস্যা ও দারিদ্র তাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। তখন জীবন ধারণই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বাঙ্গালীর এই অবনতি প্রফুল্লচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছেন। এর ওপর আছে জাতিভেদ প্রথা। এই কুপ্রথাটি বাঙ্গালী জাতির উন্নতির অন্তরায়। এই দিকেও তিনি বারে বারে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাছাড়া শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকদের বাবুগিরি ও বিলাসিতা, নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন সমগ্র জাতিকে অন্ধকারের পথে নিয়ে যাচ্ছে। প্রফুল্লচন্দ্র অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন এইসব সমস্যার সমাধান না হলে বাঙালী ভবিষৎ অন্ধকার। আচার্য আরও বেদনা পেয়েছেন বাঙ্গালী যুবকদের বিজ্ঞান শিক্ষারক্ষেত্রে। ১৯৩৭ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির ভাষণে তিনি বাঙ্গালী যুবকদের বিজ্ঞান শিক্ষার সম্বন্ধে বলেছেন—"তুই-একটি ছাড়া অধিকাংশ বাঙ্গালীর ছেলেই বিজ্ঞান পড়ে, তোতাপাখীর মত মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা গৃহে সে-গুলি কোন মতে লিখিয়া পরীক্ষা পাশ করিবার উদ্দেশ্যে মাত্র। এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর ৬ হাজার ছেলে আই. এস. সি, ২ হাজার ছাত্র বি. এস-সি ও ৪০০ ছেলে এম. এস-সি পরীক্ষা দেয়—ইহাদের মধ্যে শতকরা কেন, হাজার করা একজনও পরবর্তীকালে

বিজ্ঞান আলোচনা করে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালীর চিত্তবৃত্তির এই নিদারুণ দৈন্যই আমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে।

শুধু যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সম্বন্ধেই একথা সত্য তাহা নহে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্বন্ধেও ইহার সত্যতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। জটিল অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নে বোম্বাইবাসীদের মধ্যে পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর দাস, বালচাঁদ হীরাচাঁদ, ডেভিড সেস্থুন এবং মাড়োয়ারী সমাজ হইতে ঘনশ্যাম দাস বিড়লা প্রভৃতি স্ব স্ব প্রতিভার যোগ্য পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কিন্তু হায়! বাঙ্গালীর প্রতিভার যোগ্য অবদান এক্ষেত্রে কোথায়? ত্রিশ বৎসর পূর্বে মহামতি গোখলে বলিয়াছিলেন—What Bengal thinks to day the whole of India thinks tomorrow—বাঙ্গালীর আজিকার চিন্তাধারা কাল সমগ্র ভারত অনুসরণ করিবেই। প্রসঙ্গতঃ তিনি যে কয়জন কৃতী বাঙ্গালীর নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের সমকক্ষ সেদিন ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। আজ দিনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে—তে হি নো দিবসা গতাঃ।

বাঙ্গালীর এই শোচনীয় জীবন সমস্যায় প্রবাসী বাঙ্গালীরও দায়িত্ব আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কলিকাতা প্রবাসী মাড়োয়ারীগণ পরস্পর সহানুভূতি ও কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা ব্যবসায় বিরাট ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালী তাহাদের অপেক্ষা শিক্ষা-দীক্ষায় অধিকতর হইয়াও আজ জীবন সমস্যায় পরাভূত হইতেছেন। তাঁহাদের না গড়িয়া উঠিয়াছে ব্যবসার ক্ষেত্র, না গড়িয়া উঠিয়াছে উপার্জনের কোন স্থায়ী পথ। আদিম প্রবাসী বাঙ্গালীগণ সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন—নিঃসংশয়ে বলিব শিক্ষা তাঁহাদের ছিল—ছিল না দূরদৃষ্টি। পূর্বপুরুষগণের সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আজ তাঁহাদের প্রবাসী বংশধরদেরই করিতে হইবে। বাঙ্গালীর এই দুঃসময়ের জন্য প্রবাসী ভ্রাতাদের দায়িত্ব কত বেশী। সমাজের শিক্ষাগ্রগণ্য সম্প্রদায় প্রবাসে লইয়া আসিলেন দেশের মাটির সম্পূর্ণ ত্রুটি-বিচ্যুতি। দেশ হইতে দূরে আসিয়াও তাহার সংস্কারে তাঁহারা কোন চেষ্টাই দেখাইলেন না।

এখনও যদি প্রবাসী বাঙ্গালীগণ এ ত্রুটি সংশোধন না করেন, এ কলঙ্ক মোচনে অবহিত না হন—তবে বাঙ্গালীর ভবিষৎ অন্ধকার।”

…“ধনী মাড়োয়ারী ও গুজরাটীরা (ভাটিয়া) ধর্মে হিন্দু, তাহারা গঙ্গাস্নান করে এবং কালী মন্দিরে পূজা দেয়, গোমাতাকেও পবিত্র মনে করে কিন্তু তবু বাঙ্গালীদের সহিত তাহাদের ব্যবধান বিস্তর। উভয়ের মধ্যে যেন দুর্ভেদ্য চীনা প্রাচীর বর্তমান। আমার বক্তব্য এই যে, জাতিভেদ বাঙ্গালীর বর্তমান দুর্ভাগ্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী।”

নানা উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কত অন্ধকার। গম পেসায়ের কল চালায় অবাঙ্গালী, এ্যালুমিনিয়ামের ব্যবসা অবাঙালীর হাতে, পাট কলের মালিক অধিকাংশই অবাঙালী, কুলী, মজুর, মজুরদের ঠিকাদার, মুচি সবই অবাঙ্গালী। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বিড়ি খায়। সেই বিড়িও তৈরি করে অবাঙ্গালী। অধিকাংশ গোয়ালা অবাঙ্গালী। অথচ এইসব ব্যবসা অনায়াসে বাঙ্গালী করতে পারে। কিন্তু ব্যবসার পথ বাঙ্গালী বড় একটা মাড়ায় না। অনেকের মতে অর্থাভাবে বাঙ্গালী ব্যবসা করে না। এই মত প্রফুল্লচন্দ্র মানেন না। তাঁর মতে—“অনেকের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই—অর্থের অভাবেই বাঙ্গালী ব্যবসার ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিতে পারিতেছে না—আমি একথা বিশ্বাস করি না। রেল খুলিবার পূর্বে রাজপুতানার মরুভূমি হইতে অশিক্ষিত যেসব মাড়োয়ারী পদব্রজে বাঙ্গলা দেশ প্রবাস জীবন-যাপন করিতে আসিয়াছিল। দিনান্তে সামান্য ছাতুদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বংশধরদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন—বিরাট ব্যবসাক্ষেত্র ও প্রভূত অর্থ।……পঞ্চাশ বা একশত বৎসর পূর্বে মুষ্টিমেয় যে কয়জন বাঙ্গালীর একমাত্র জীবনোপায়—চাকরী বা ওকালতী করিতে বাঙ্গালার বাহিরে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা একটি বিষয় ভুল করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের এই ভুলের ফসলই হইতেছে—তাঁহাদের প্রবাসী বংশধরদের ভীষণ জীবন সমস্যা।”

বাঙ্গালীর এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ কি? প্রফুল্লচন্দ্রের মতে

বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি। এর ফলেই বাঙালী শ্রমবিমুখ হয়ে যাচ্ছে এবং গ্রামে ফিরতে তাদের অনীহা। বাঙালী কৃষকদের অবস্থাও ক্রমাবনতির পথে। প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন— "বাংলার কৃষক সমাজের অবস্থা আজ কি যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। এই যে প্রজাদের চৌষট্টি হাজার খাওয়া হয়, তার পরিবর্তে দেওয়া হয় কি, তার কি কোন হিসেব আছে? হিসেব আমরা কোন্ দিকেই বা করি? আজ হিসেবের দিন এসেছে—হিসেব করে আমাদের বাঁচতে হবে এর জন্য অনেককে মরতেও হবে। এই বিপুল দায়িত্ব নেবার জন্য যদি কেহ প্রস্তুত হয় তবে জেনো এরা তরুণ-এরা ছাত্র-এরাই বিধাতার বর পুত্র।" এই উক্তির মধ্যে বাঙ্গালীকে উঠে বসবার আহ্বান দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় তিনি একই কথা বারে বারে বলে বাঙ্গালীর চৈতন্যোদয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। বাঙ্গালীর সমস্যার শেষ নেই। সেই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় তিনি বলেছেন। বাঙালী যাতে মেরুদণ্ড সোজা রেখে চলতে পারে তার জন্যে তিনি অনেক সময় নানা উক্তির মধ্যে বাঙালী চরিত্রকে কটাক্ষ করে ব্যঙ্গ করেছেন। কখনো ঘা মেরেছেন আবার কখনো বা উদ্দীপনাময় কথা বলেছেন।

বাঙ্গালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি অধিকাংশ স্থানেই ভিন্ন প্রদেশবাসীদের কথা বলেছেন। মনে রাখতে হবে এর মধ্যে কোন বিদ্বেষ ভাব নেই। তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তিনি দেখে শেখার ইঙ্গিত দিয়েছেন। বাঙ্গালীর বস্ত্র সমস্যার সমাধান কল্পে প্রফুল্লচন্দ্র চারটি উপায় বলেছেন। প্রথম উপায় তুলার বীজ কৃষিক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় উপায় সূতাকাটা। তৃতীয় উপায় খাদির কাপড় বোনা। চতুর্থ উপায় খাদির কাপড় পড়া। ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে একই উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন— "বিলাতী সুতায় কাপড় পরা পাপ, কেননা দেশের দারিদ্র্য বিদেশী সুতার কাপড়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বিলাতী সূতার দেশী কাপড়ও যা,

বিলাতী কাপড়ও তাহাই। দেশবাসী পাপজ্ঞানে উহা বর্জন করিবেন। উৎসবে ব্যবহার করিতে খাদি, বিবাহের যৌতুকে খাদি ও মৃতের আচ্ছাদনীয় খাদি। খাদি আজ আর রাজনৈতিক মত বিশেষের নিশান নহে, উহা এই বুভুক্ষু ও নগ্ন দেশের দারিদ্র্যের স্মারক, উহা মৃতবৎ অসাড় দেহে জীবন সঞ্চারের লক্ষণ।"

বাঙ্গালী যদি বাঁচতে চায় তবে তাকে শ্রমের প্রতি মর্যাদা দিতে হবে। কঠোর পরিশ্রম না করলে কোনদিনই সুফল ফলবে না। জগতে যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা সকলেই পুরুষকারের বলেই নিজের ভাগ্যকে ফিরিয়েছেন। প্রফুল্লচন্দ্রও সেই পথ অনুসরণ করবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। 'শ্রমের মর্যাদা বোধ' প্রবন্ধের শেষে বলেছেন—"বাঙ্গালীকে যদি আজ দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে জীবন সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হইতে হইবে। বাংলাদেশে বাঙ্গালীর স্থান যে কোথায় তা পূর্বে বহুবার বলিয়াছি। আজ সকলরকম ব্যবসা বাণিজ্য বাংলাদেশে অবাঙ্গলীর হাতে—বাঙ্গালী আজ সামান্য চাকুরিয়া মাত্র। বাঙ্গালী আজ বাবু বলিয়া পরিচিত। সামান্য কায়িক পরিশ্রমে বাঙ্গালী অপমান বোধ করে। কায়িক পরিশ্রমের কাজে বাঙ্গালী ভয় পায়। ইহার ফলে বাংলাদেশে আজ বাঙ্গালী কুলী, মজুর, কারিগর, রাজমিস্ত্রি, ছুতার-মিস্ত্রি, কলের কুলী ইত্যাদি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। এই সমস্ত কাজ বাংলাদেশে এখন শতকরা ৯০ জন অবাঙ্গালী বাংলার টাকা নিজের দেশে লইয়া যাইতেছে। আর বাঙ্গালী বিনা অন্নে প্রায় ধ্বংসের পথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইভাবে চলিলে আর পঞ্চাশ বছর পরে বাংলাদেশে জনকয়েক উকীল মোক্তার ও জন কয়েক অপিসের বাবুছাড়া আর অন্ততঃ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"

প্রফুল্লচন্দ্রের মত পড়ুয়া সংখ্যায় খুবই নগণ্য। কলকাতার Imperial Library ও University Library থেকে প্রফুল্লচন্দ্র বছরে এক হাজার বই নিয়ে পড়তেন। আসল কথা হল জ্ঞান স্পৃহা। প্রফুল্লচন্দ্রের জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। পড়বার এবং জানবার প্রতি তাঁর একটা আগ্রহ ছিল। লেখাপড়া শেখবার জন্যে, জ্ঞান-অর্জনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না হলেও চলে। পাঠাগারগুলিকে ব্যবহার করে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করা যায় পৃথিবীতে এমন অনেক জ্ঞানী ও প্রতিভাবান মানুষ আছেন যাঁদের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নেই। এই ছাপ না থাকার জন্যে জ্ঞান অর্জনে তাদের কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন— "প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ছু ঘণ্টা পড়লে বছরে একটা সাধারণ লাইব্রেরির সমস্ত বই পড়ে শেষ করা যায়। নিজের চেষ্টাতেই লোকে মহাজ্ঞানী হতে পারে। পরের আর সাহায্য আবশ্যক হয় না।

ইংররেজীতে একটা কথা আছে মানুষের সঙ্গী দেখিলেই তাকে চেনা যায়। আমি বলি। মানুষকে বই পড়তে দেখলেই তাকে চেনা চেনা যায়। আসল কথা হচ্ছে পড়া দরকার। যাকে বলে well informed তাই হওয়া দরকার। Well iuformed না হতে পারলে লেখাপড়া শেখার কোন সার্থকতা নেই!

সাহিত্য রসিক প্রফুল্লচন্দ্র

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন কর্মবীর। সারা জীবন তিনি কাজের মধ্যে দিয়ে কাটিয়েছেন। কিন্তু সাহিত্যের পিপাসা তাঁর কম ছিল না। ছাত্র-জীবনের প্রথম দিকে তিনি সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরে বিজ্ঞান সাধনায় মনোনিবেশ করলেও সাহিত্যের প্রতি একটা আকর্ষণ তাঁর ছিল। সময় পেলেই তিনি সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থ পড়তেন। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় বিভিন্ন কবিতার উদ্ধৃতি আছে। এই উদ্ধৃতি থেকে তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা সাহিতের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন না। ১৯৩৭ সালে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন—"বাঙলা সাহিত্য গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে অনেক উন্নতি করিয়াছে। এই সম্মেলনগুলি সেই উন্নতির সহায়ক। প্রত্যেক বিভাগেই বিশেষভাবে গবেষণা চলিতেছে এবং পঠন-পাঠন ও আলোচনা বৃদ্ধি পাইয়াছে।......জাতীয় সাহিত্যই জাতির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে। জাতির মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল অবস্থার পরিচায়ক ও পরিমাপক—জাতীয় সাহিত্য। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের জাতির সমাজ বিপ্লব, ধর্মবিপ্লব ও রাষ্ট্র বিপ্লবের ইতিহাস জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়াই আমরা পাই।......আজ আপনারাও মাতৃযজ্ঞের এই মণ্ডপে, এই সারস্বত সম্মেলন বাসরে এই মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করুন। বাংলাভাষা উন্নতি বিধানে সকলে বদ্ধপরিকর হউন। আজ মাতৃভাষার এই যজ্ঞ-বেদীমূলে বসিয়া, আসুন আমরা সমবেত কণ্ঠে গগন পবন প্রতিধ্বনিত করিয়া বলি—

"আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য
মানুষ আমরা, নহি ত মেষ।

দেবী আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার, আমার দেশ।"

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন—"আজ আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা প্রভাবে তাঁহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। ……বসন্তের অতৃপ্ত কোকিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে যেমন একদিকে বিরহের উচ্ছ্বাস গীতিকা গাহিতে লাগিল, আবার আনন্দমঠে স্বদেশপ্রেমিকতার ভৈরব নিনাদ, অপর দিকে সংযম, আত্মনিবৃত্তি, যোগ, অনুশীলন সুখ, দুঃখ ইত্যাদির উচ্ছ্বাসে বঙ্গদর্শন বঙ্গদেশে নূতন যুগ আনয়ন করিল। সেই আলোক সামান্য প্রতিভায় উৎসাহিত হইয়া আজ বাঙলা সাহিত্য সমগ্র ভারত সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভাবারি সিঞ্চন করিয়া উর্বরতা সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত, শ্রী মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যের কাব্যাংশ কণকাভরণে সাজাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রফুল্লচন্দ্রের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর লিখেছিলেন—"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে সমগ্র দেশ আজ বিষাদাচ্ছন্ন।……রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ও ভারতের নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক……সাহিত্যে ও ভাষায়, কর্মে ও চিন্তায় বাঙালীকে যে অগাধ সম্পদ তিনি দান করিয়া গেলেন তাহার তুলনা নাই।……সমস্ত দেশের প্রাণে যে অনুভূতি ও প্রেরণা তিনি সঞ্চার করিয়াছেন তাহা চির গতিশীল ও চিরচলিষ্ণু। সব দেশের সব কালের নির্য্যাতিত জনগণের কণ্ঠে তাঁহারই বাণী ফুটিয়া উঠিবে—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ, উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।

…ভারতের কবি সৌন্দর্যের পূজার সঙ্গে সঙ্গে আত্মানুভূতির চেষ্টা করিয়াছেন। এই আত্মানুভূতির প্রেরণাই ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সত্য এবং এখানেই রবীন্দ্র সাহিত্যের সার্থকতা। ইহাতে আত্মানুভূতির যে বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে একটি কথায় রবীন্দ্রনাথ নিজে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার বিগত ২৫শে বৈশাখের স্মরণীয় বিবৃতিতে—মনুষ্যত্বের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলিয়া মেনে নেওয়া আমি অপরাধ বলে মনে করি।”

রজনীকান্ত সম্পর্কে বলেছেন—“রজনীকান্ত সাধক ছিলেন বলিলে যথেষ্ট হইল। কবিতাপুষ্প চয়ন করিয়া রজনীকান্ত আবেগের ধূপ ধূনাতে আমোদিত করিয়া আজ কয়েক বৎসর হইল মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে সাধন উৎস প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা শুধু কবির স্বীয় হৃদয়ের পবিত্র নিলয়টি অধিকতর পবিত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই উহা বঙ্গবাসীর অন্তঃস্তলে প্রবেশ করিয়া সরল সাধনার একটি যুগ আনয়ন করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।…সঙ্গীতই রজনীকান্তের সাধনার পথ। তিনি বনবিহঙ্গের ন্যায় যখন তখন আপন মনে ভাবের বন্যায় নাচিতেন, গাহিতেন।” রজনীকান্তের ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই’ গানটি প্রফুল্লচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রজনীকান্তের সাহিত্য সাধনার প্রকৃতি ও দেশাত্মবোধ সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র জানতেন একটি জাতির পরিচয় নিহিত থাকে তার সাহিত্যে। সাহিত্য পাঠ করলেই একটা জাতিকে জানা যায়। সেইজন্যে তিনি দেশী-বিদেশী সাহিত্য পড়তেন এবং তা বুঝবার চেষ্টা করতেন।

জাতীয় মুক্তির অন্তরায়

ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রামমোহনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় প্রবন্ধে। প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"যে জাতির শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভাবের ঘরে এত লুকোচুরি চলে তাহাদের মুক্তি সুদূরপরাহত। ...এক শতাব্দীরও পূর্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সত্যের পূজা প্রবর্তন করেন। সে কি অন্ধকারযুগের তিমির রাত্রি আমরা দেখিয়াছি। ধর্মের নামে রোরুদ্যমানা জননীর বক্ষ হইতে নবজাত শিশুকে ছিনাইয়া লইয়া পিতাই নিজ ঔরসজাত পুত্রকে সমুদ্রগর্ভে হাঙ্গরের মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে! গভীর জঙ্গলের মধ্যে কালী মন্দির স্থাপন করিয়া কোন হতভাগ্য পরিবারের নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক শিশুকে চুরি করিয়া আনিয়া ধর্মের নামে নরবলি দিয়া মহা পুণ্য সঞ্চয় করিলাম ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় স্ত্রীকে টানিয়া হ্যাঁচড়াইয়া লইয়া, বাঁশ চাপ দিয়া জীবন্ত পুড়াইয়া মারিয়া ভাবিতেছে ইহাই সত্যধর্ম পালনের পরাকাষ্ঠা হইল। গুরুবাদ, কর্তাভজা এবং বামাচারাদি বহু দুর্নীতিমূলক অনুষ্ঠানের প্রচলন করিয়া গার্হস্থ্য এবং সামাজিক জীবনে দুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়া ধর্মের নামে সমাজে জীবন্ত নরকের প্রতিষ্ঠা করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা জন্মের মত নষ্ট করিয়া দিতেছে।"

এই একই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় কি কি। তাঁর মতে পাপ, দুর্নীতি, ব্যভিচার, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা, অশ্লীল সাহিত্য ও চলচ্চিত্র প্রভৃতি। ব্রাহ্ম সমাজ এসবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। তাই

তাঁর কাছে—"আমার মতে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ হিমালয় শিখরের ন্যায় উচ্চ এবং মহান।...আমি দেখিয়াছি সত্যসন্ধানী ও সত্যাশ্রয়ী না হইলে কি মানুষ, কি জাতি কিম্বা কি দেশ কাহারও মাথা খাড়া করিয়া উঠিবার সাধ্য নাই। ...লোকচক্ষুর অন্তরালে নহে, কিম্বা মনের গোপন প্রকোষ্ঠের মধ্যে নহে—জগৎ সভায়, বিশ্বমানবের সম্মুখে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া অকুতোভয়ে বুক ফুলাইয়া সতেজ দীপ্ত অনুরাগের সহিত সত্যের জয় গান কর। ...এস, কে আছ হৃদয়বান! কে আছ প্রেমিক! কে আছ বীর। উহাদিগকে উঠাও, তোল, মানুষ কর। প্রেমামৃত ধারায় সহস্র সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষ বহ্নি নির্বাপিত করিয়া দাও। দারিদ্র্যের পর্ণ-কুটীরে পাঠশালার বাণী মণ্ডপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, হাটে, বাটে, ঘাটে, বাজার, বন্দরে, পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে ব্রাহ্মধর্মের এই মৃত-সঞ্জীবনী বার্তা লইয়া যাও, আর বল তোমাদের মহানিশার অবসান হইয়াছে।"

বাংলার জমিদারবর্গ

প্রফুল্লচন্দ্র বাংলার জমিদারদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। জমিদারদের স্বরূপ ও প্রকৃতি তিনি জনসমক্ষে উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। বাংলার পল্লী অঞ্চলের দুরবস্থার জন্যে জমিদাররাই দায়ী। জমিদারী প্রথা পত্তনের পর থেকে শোষণ আর অত্যাচারে পল্লীগুলি জর্জরিত। প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন— "ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে যত হৌসের মুচ্ছুদি প্রায় সবই বাঙালী ছিল; অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যও বাঙালীর একচেটিয়া ছিল। কিন্তু এই হৌসের মুচ্ছুদিরা যখন কলকাতার আশেপাশে বাগানবাড়ী করিয়া নানা প্রকারে বদখেয়াল ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন, এবং জমিদারী কিনিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার হইল। আমাদের দেশের ধনী লোকের বংশধরগণ জড়বৎ মাংসপিণ্ডের সমষ্টি এবং মস্তিষ্ক চালনার অভাবে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। অধিকাংশ জমিদারীই তিন পুরুষের মধ্যে দুর্দশাগ্রস্ত হয়।......বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বাঙালী জমিদারগণের মধ্যে বহুদিন হইতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।" প্রথমদিকে জমিদারগণ গ্রামের প্রতি নজর রাখতেন। অত্যাচারী হলেও গ্রামের টাকা গ্রামেই ঘুরে ফিরে আসতো। জমিদারগণ পুকুর ও দীঘি খনন করতেন, পঙ্কোদ্ধার ও রাস্তা ঘাটের দিকে নজর দিতেন। কলকাতায় বিলাসবহুল জীবনের আস্বাদ লাভ করার পর পল্লী ছেড়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে নোংরামির চূড়ান্ত পর্যায়ে নেমে যান। গ্রামের দুর্দশার জন্যে দায়ী জমিদারগণ। জমিদারদের গ্রামত্যাগ, বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া, টাকার জন্যে নায়েবদের ওপর হুকুম, গ্রামে নায়েবদের অত্যাচার, অত্যধিক বিলাসিতার জন্যে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়া প্রভৃতি কারণগুলির জন্যেই বাংলার পল্লী অঞ্চল দীন-হীন হয়ে পড়েছে। এর মূলে আছে

জমিদাদের অলসতা ও অপদার্থতা। এবিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন—"আমাদের দেশের জমিদারগণ বহুদিন হইতে যে অলসতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা পোষণ করিয়া আসিতেন, আজ তাহা শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দীন পল্লীমাকে হতশ্রী করিয়া সহরের বিলাসকুঞ্জে আরামে জীবন-যাপনেরই এই ফল। বাঙলার জমিদার বংশ এতকাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাস-ব্যসনের পরাকাষ্ঠা দেখাই-য়াছেন। তাঁহারা এতদূর সঙ্কটাপন্ন না হইত, তালা হইলে কতকটা আশা-ভরসা থাকিত। কিন্তু সমস্ত দিক দিয়া বাঙালীর পরাজয় ঘটিতেছে এবং আর এক শতাব্দী পরে বাঙলার অবস্থা যে কিরূপ হইবে তাহা কল্পনা করিতে শিহরিয়া উঠিতেছি।"

ভাল জমিদারদের কথা বলতে প্রফুল্লচন্দ্র গর্ব বোধ করতেন। কিন্তু এঁদের সংখ্যা নগণ্য। অধিকাংশই অলস, বিলাসী, স্বার্থপর ও অপদার্থ। এঁরাই ছলে বলে কৌশলে গরীব প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতো। প্রফুল্লচন্দ্র মন্তব্য করেছেন— "বাঙ্গলার জমিদারবর্গের উপর দেশের ও দশের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা এবিষয়ে একেবারেই উদাসীন। বাঙলা দেশের কৃষিজীবী আজও অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তদুপরি ঋণগ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের জীবনযাপন অধিকতর দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। পরনে কাপড় নাই, দুবেলা অন্ন জোটে না। কিন্তু আজও তাহাদের ভূস্বামিগণের বিলাস ব্যসন চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা প্রাণপাত করিয়া তাহাদের সর্বস্ব দিয়া রিক্ত হইয়া গৃহে ফিরিতেছে। আর সেই নিরন্ন প্রজাগণের শোণিত ধারা অর্থবল তাঁহারা নানারূপে বদ্‌খেয়ালে অকাতরে নিঃশেষ করিতেছেন।"

"মানবজীবনের সত্যকার সার্থকতা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। আজ বাঙ্গালীর অন্নসমস্যার সঙ্গে জমিদারদিগের সমস্যা সম্পূর্ণ বিজড়িত। আজ যদি বাঙলার জমিদারবর্গের এইরূপ দুর্গতি না হইত তাহা হইলে দেশ এতদূর হতশ্রী হইত না; এবং দেশের শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য এমন ভাবে তিরোহিত হইত না।"

পাখী ও জন্তুপ্রীতি

জীব জগতের প্রতিও কর্মব্যস্ত প্রফুল্লচন্দ্রের দরদ ছিল। পশু-পাখীর প্রতি প্রীতি শুধু মুখের কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পশুপাখীর প্রতি ভালবাসা ছিল বলেই তিনি এদের নিয়ে চারটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বাস করতেন— "অকপট স্নেহ, যত্ন ও সৌজন্য দ্বারা পশু পক্ষীকে সহজেই বশীভূত করা যায়।" আমাদের দেশে দ্বিজেন্দ্রলাল পাখীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি সর্বদা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন এবং পাখীদের রীতি-নীতি, স্বভাব-চরিত্র, জীবন-যাপনের প্রথা লক্ষ্য করতেন। বিহঙ্গকুলের সঙ্গে তাঁর একটি সখ্যতা স্থাপিত হয়েছিল। 'বিহঙ্গকুলের বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জন' আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের মত আর একজন পশু-পাখী প্রেমিক লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। 'থোরো অসীম ধৈর্যের সঙ্গে পশু-পাখীদের বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন এবং তাদের ভালবাসা পেয়েছিলেন। থোরো সম্পর্কে Emerson আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন—"The other **weapon with which he conquered all obstacles in sincere was patience. He knew how to sit immovable, a part of the rock he rested on, until the bird, reptile the fish which had retired from him, should come back and resume his habits, nay, moved by curiosity, should come to him watch him."** অর্থাৎ ভালবাসা, করুণা ও দাক্ষিণ্য ইতর প্রাণিগণকেও মুগ্ধ এবং বশীভূত করে।

'সুন্দর বনের গণ্ডার লোপ' আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন বিভিন্ন পশু-পাখী বিলুপ্ত হয় মানুষের জন্যে। সত্যচরণ লাহার কালিদাসের পাখী গ্রন্থের আলোচনা প্রফুল্লচন্দ্র করেছেন। এরূপ গ্রন্থ রচনার জন্যে প্রফুল্লচন্দ্র প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

কলকাতার অতীত

যে সহর কলকাতাকে ঘিরে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের চাকা আবর্তিত হয়েছিল সেই কলকাতা ও সহরতলীর অতীতের কথা তিনি লিখেছেন। ১৮৭০ সালে প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতায় আসেন। তারপর দীর্ঘকাল তিনি সহর কলকাতায় বাস করেছেন। ৫৪ বছর আগে কলকাতা ও সহরতলী কিরূপ ছিল তার বিবরণ দিয়েছেন। প্রফুল্লচন্দ্র যখন কলকাতায় আসেন তখন সবেমাত্র খিলান করা নর্দমা তৈরী হচ্ছে। দু-একটি রাজপথ নির্মিত হচ্ছে আর নতুন জলের কল এসেছে। সেই সময়কার বিবরণ হলো—"পথের দুই পার্শ্বে উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী (পগার) ছিল। সেই পগার দিয়া অতি কদর্য পঙ্কিল আবিল জলের স্রোত বহিত। সেই জলের chemical character-এর কথা বলিতে চাহি না। তাহাতে ছিল না এমন জিনিস নাই। তাহার গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হইত। আর সেই পগারের পারে গৃহস্থবাড়ী ও দোকান প্রভৃতি ছিল। প্রত্যেক পগার পার হওয়ার জন্যে সাঁকো ছিল। অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে যে, গাড়ী ঘোড়া একেবারে তাহার ভিতর গিয়া পড়িয়াছে।.........পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদিতে কতরূপ জীব যে ভাসিয়া বেড়াইত তাহার ইয়ত্তা ছিল না। দুর্গন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইত। পায়খানার মলও তাহাতে ঢালা হইত। আমার সম্পর্কীয় জ্যেঠামহাশয় প্রভৃতি যাঁহারা তখন কলিকাতায় চাকরি করিতেন তাঁহারা বলিবেন—হাটখোলা, কুমারটুলী প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক মেথর গঙ্গায় বিষ্ঠা ঢালিত। স্রোতে সে সমস্ত ভাসিয়া বেড়াইত। কাপড় কাচিবার সময় তাহাতে সেই মল লাগিয়া যাইত, আর স্নানের সময় সিমন্তিনীদের কেশ গুচ্ছে তাহা জড়িত হইয়া যাইত। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। তখনকার তুলনায় এখন কলিকাতা স্বর্গ।"

মশামাছির উপদ্রব ছিল। এখনকার মত চৌরঙ্গির প্রসার ছিল

না এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেরও তেমন প্রসার ছিল না। হাইকোর্টের নতুন বাড়ি এবং হাওড়ার ব্রীজ নির্মিত হয়েছে প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র জীবনে। চেতলা, কালীঘাট, ভবানীপুর একেবারে পল্লীগ্রাম ছিল। দেখতে দেখতে এইসব অঞ্চলের এবং উত্তর ও মধ্য কলকাতায় রূপান্তর ঘটেছে। স্বল্প কথায় সেকালের কলকাতার এক নিখুঁত চিত্র উপস্থিত করেছেন।

উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও আরও অনেক বিষয় নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। মৃতপ্রায় জাতিকে তিনি নতুন পথে চলবার আহ্বান জানিয়েছেন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী প্রতিম এই মানুষটি সমগ্র জীবন দেশের ও দশের কল্যাণের চিন্তায় আত্ম-নিমগ্ন ছিলেন। ৮৩ বছর তিনি বেঁচেছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি ব্যক্তিগত আত্মসুখের কথা ভাবেননি। বিশ্রাম নেওয়ার কথা কখনো চিন্তা করেন নি। শেষের দিকে তাঁর শরীর ভেঙে গিয়েছিল নিরলস পরিশ্রমের জন্যে। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি বিভিন্ন জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন, যারা পরামর্শ চেয়েছে তাদের পরামর্শ দিয়েছেন এবং জাতিকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। কখনো কোন অবস্থাতেই তিনি ভেঙে পড়েন নি। তিনি ছিলেন জাতির সঞ্জীবনী সুধা। প্রফুল্লচন্দ্রের দীর্ঘ কর্মজীবনের অবসান হয় ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন বাংলা ১৩৫১ সালের ৩রা আষাঢ়।

বাংলায় মনীষার অভাব নেই। কিন্তু এমন সর্বত্যাগী, দেশের কল্যাণ কামনায় উৎসর্গীকৃত আত্মা খুবই বিরল। অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও তিনি তা নিয়ে কখনো গর্ব করেন নি। কত মানুষকে যে তিনি অন্যের অজান্তে অর্থ সাহায্য করেছেন তার ঠিক নেই। কখনো আত্মপ্রচার চাইতেন না। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্র-নাথের উক্তি দিয়ে গ্রন্থটি শেষ করা হলো। কারণ এই মহামনীষী

সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই শেষ কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

"আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই। যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন—কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজকেই পেয়েছে। বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন। কত যুগের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাস্থিত অনভিব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধ শক্তি। সংসারে জ্ঞান তপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক—তিনি বললেন আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্ম বিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে, তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহুচিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনো সম্ভবপর হোত না। এই যে আত্মদান মূলক সৃষ্টি শক্তি এ দৈবী শক্তি। আচার্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না। তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। আচার্য নিজের জয়কীর্তি নিজেই স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয় প্রেম দিয়ে।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন আলোচনার সময় তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছি। কিন্তু এর বাইরেও আরও কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও বক্তৃতা আছে। তার কয়েকটি বিশেষ রচনার ও বক্তৃতার বিশেষ বিশেষ অংশগুলি উদ্ধৃত করা হলো।

বিজ্ঞানসভা—পুরাতন ও নূতন

আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার যে উন্নতি হইতেছে না, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, যাঁহারা শিক্ষকতা করেন তাঁহারা কেবল উপাধিধারী মাত্র। জাপান, ইউরোপ এবং আমেরিকাতে যাঁহারা বিজ্ঞান-শাস্ত্রের স্ব স্ব বিভাগে মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই পথ অবলম্বন করা হয় নাই বলিয়া ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষা ফলপ্রসূ হয় নাই। আমাদের বিজ্ঞান সভা-দেশের বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উচ্চ উপাধিধারী যুবকদিগের মধ্য হইতে নির্বাচন করিয়া মাসিক দুইশত টাকা হিসাবে দুইবৎসরকাল প্রাপ্যবৃত্তি প্রত্যেক বৎসরের একটি করিয়া নিজ আয় হইতে অনায়াসে প্রদান করিতে পারিত। ইহাতে অন্য কোন ফল না হউক, এতদিনে এই সকল লোক প্রকৃত বিজ্ঞানশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া দেশী বিদ্যালয় সমূহে অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিজ্ঞানশিক্ষার প্রথা উপযুক্ত দিকে চালিত করিতে পারিতেন। ইহাদের মধ্যে দুই একজনও বিজ্ঞানসভার কল্যাণে মৌলিক গবেষণায় বিশেষ ফললাভ করিতে পারিলে কি কম গৌরবের বিষয় হইত? দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধীধারী যুবকরা যদি স্বদেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয় হইতে সামান্য রকমেরও গবেষণা কার্য করিতে পারিত, তাহা হইলে আজ কি বিদেশীয়েরা আমামাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া বলিতে পারিত যে, বাঙালীর মৌলিক

বিষয়ে চিন্তা করিবার ক্ষমতা নাই। আজকাল আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষার যেরূপ উৎসাহ দেখা যাইতেছে তাহাকে কে বলিতে পারে যে ডাক্তাব সরকার যে পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন পুনরায় সেই পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে না? বিজ্ঞান-সভা এতদিনে যদি সামান্য রকমেরও কোন কার্য্য দেখাইতে পারিত, তাহা হইলে বাঙালী নামের গৌরবের জন্য অনেকেই অকাতরে অর্থ দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না হইয়া, ডাক্তার সরকার প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানসভার দ্বারা বাঙালী যে সাধারণের হিতকর কার্য্যে অপটু এইরূপ অপবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র।

আজকাল অর্থকরী শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে আশা করি পুরাতন ও নূতন বিজ্ঞান-সভা একমত হইয়া কার্য্য করিলে বিশেষ ফললাভ হইতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের একমাত্র বক্তব্য যে, কার্য্যকরী সভা নির্বাচনের সময় যাহাতে উহা দেশস্থ সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। দুইটি পৃথক বিজ্ঞান-সভা হইলে অর্থ ও সামর্থের যে অপচয় হইবে, তাহা আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না।

বিষয়টি বড় গুরুতর। আমরা সমালোচনায় বিশেষ পটু। কিন্তু কাজে নামিতে হইলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি। ব্যবসায় বলুন, বাণিজ্য বলুন সভা বলুন আর সমিতি বলুন, যেখানে পাঁচজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা প্রয়োজন, সেইখানেই আমাদের গলদ 'বাহির হইয়া পড়ে। বিবাদ বিসম্বাদে সমস্ত বলক্ষয় হয়। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। মহৎ কোন উদ্দেশ্যের জন্য আত্মপ্রাধান্য লোপ করিতে আমরা জানি না। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাবে আজ জাপান জগতের পূজ্য ও আদর্শ স্বরূপ; কিন্তু ভারত সত্য সত্যই ঘুমায়ে রয়।

বিজ্ঞানচর্চা প্রাচীন ও নব্য ভারতের একনিষ্ঠ সাধনা

বহুশতাব্দী পূর্বে আমাদের বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে হইলে যদি একাগ্রমনা ছাত্রের পক্ষে অন্ততঃ দ্বাদশবর্ষ শিক্ষা করা কর্তব্য বিবেচিত হইত, তবে এই সময়ে ঐ শাস্ত্রে পারদর্শী হইতে হইলে আরও কত বর্ষ অধ্যয়ন করা উচিত বল দেখি? বর্তমান সময়ে রসায়নশাস্ত্র সকল বিজ্ঞানের মধ্যে বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহার চর্চার দ্বারাই এখন জাতীয় অদৃষ্ট স্থিরীকৃত হয় এবং জার্মানগণ সযত্নে ইহার চর্চা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা জগতে রাষ্ট্রনৈতিক সোপানের শ্লাঘনীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল জ্ঞানান্বেষণ-হেতু বিজ্ঞান অনুশীলন করা যায়, আবার কোন প্রকার দুরভিসন্ধির কার্য্যেও তাহাকে নিযুক্ত করা যায়। যিনি বিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রকৃত লিপ্ত তিনি প্রকৃতির গুপ্ত তথ্য আবিষ্কৃত করিতে পারেন বলিয়া যথার্থ আনন্দ উপভোগ করেন। যদি মুহূর্তের জন্যও আমি মিল্‌টনের তূর্য্যধ্বনির অধিকারী হইতাম, তাহা হইলে বলিতাম যে আমাদের জাতি নির্বোধ নহে; পরন্তু তীক্ষ্ণ ধী-শক্তিসম্পন্ন, অপূর্ব মানসিকবলে বলীয়ান, উদ্ভাবনে পটু, কূটতর্কে নিপুণ এবং মানবের শ্রেষ্ঠ শক্তির সর্বোচ্চ শিখর স্পর্শ করিতেও অক্ষম নহে। এই জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানের অধিকারীগণ আমাদের মধ্যে এত প্রাচীন ও ব্যুৎপন্ন যে বুদ্ধিমান লেখকেরাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পিথাগোরাসের মতাবলম্বীরা এই ভারতের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

এই ত গেল অতীতের কথা—এখন একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, কেন এই সহস্র বৎসর কাল ভারত নিবিড় তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিল—কেন বিজ্ঞানালোচনা একেবারে তিরোহিত হইল? কেন বিদ্যানুশীলন লোপ পাইল—কেন দীপ নির্বাপিত হইল? সংস্কৃত

সাহিত্যের ইতিহাস-বেত্তা বেবর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন ভাস্করাচার্য্য—যিনি খৃঃ অঃ ১১শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন—ভারত নভোমণ্ডলের শেষ তারকা। বলা বাহুল্য খৃঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির প্রভৃতি গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করেন। কেন বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পুণ্য ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম-অভিমুখী হইলেন?

ইহার পর হইতেই আরবজাতি সদর্পে বোগ্‌দাদ হইতে জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া আফ্রিকার উত্তর ভাগ উল্লঙ্ঘন পূর্বক স্পেন জয় করিয়া তথায় সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানালোক বিস্তার করিতে থাকিলেন। এই প্রকারে গ্রানাডা, সেভিল, টোলিডো প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, গণিত, পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র অধ্যাপনা হইতে লাগিল—ইউরোপের নানাদেশ হইতে ইংলণ্ড, জার্মানি, ফরাসী প্রভৃতি সহস্র সহস্র যুবক আসিয়া জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। খৃঃ ১৫শ শতাব্দী শেষভাগে মুর জাতি স্পেন হইতে বিতাড়িত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যে দীপ জ্বালিয়াছিলেন তাহা আর নিবিল না—ঠিক সেই সময়ে কোপার্ণিকাস্ জন্মগ্রহণ করিলেন এবং পর পর ঠিক পৌর্ব্বাপর্য্য হিসাবে টাইকোব্রাহী, কেপ্‌লার, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি মনীষীগণ ইউরোপে বিজ্ঞানের নবযুগের অবতারণা করিলেন।

প্রায় ৬০ বৎসর হইল আমার জন্মস্থানের অতি সন্নিকটস্থ কপোতাক্ষতীরবাসী অমর কবি মর্ম্মবেদনায় গাহিয়াছিলেন—

“কোথায় বাল্মীকি ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।”

আমিও খেদোক্তি করিতেছি—হায়! হায়! কোথায় আজ আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির আর কোথায় বা সেই

রাসায়নিকবৃন্দ—নাগার্জ্জুন, যশোধর, স্বচ্ছন্দভৈরব প্রভৃতি ? আবার কি এই অভাগা দেশে সে প্রকার মানুষ জন্মিবে না ? আমাদের জাতি যেন নিষ্প্রভ অসার জড়বৎ হইয়া রহিয়াছে। অনেকে বলেন সুযোগের অভাব। কিন্তু আমার তাহাও ত মনে হয় না—১৮৩৫ খৃঃ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে—এই ৮৪ বৎসর যাবত তথায় উদ্ভিদ্-প্রাণী-অস্থি-শারীর বিদ্যা প্রভৃতি অধীত হইতেছে, কিন্তু কই এমন কাহাকেও দেখি না যিনি নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়াছেন। একবার ইউরোপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাউক। ফরাসী দেশের একজন ব্যবহারাজীবী লিয়োনো সারা-জীবন শুঁয়োপাকা প্রজাপতিত্বে পরিণত হইবার পূর্বে কি প্রকারে দাঁত বসাইয়া কঠিন কাঠের ভিতর ছিদ্র করে এই প্রশ্নের মীমাংসায় ব্রতী ছিলেন ! হুবর নামক একজন প্রণীবেত্তা আজীবন মধুমক্ষিকার জীবনযাত্রা (**Life History**) লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যৌবন কালেই অন্ধ হইয়া পড়েন। এই কারণে তিনি স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিতে অপারক হইলেন। কিন্তু তাঁহার বিদুষী পতিব্রতা সহধর্মিণী তাঁহার জন্য মৌমাছির আচার ব্যবহার, রীতিনীতি সমুদয় সযত্নে অধ্যায়ন করিতেন এবং তাঁহার স্বামী এই-সমস্ত শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিতেন। হুবর এই প্রকার একাগ্রতা ও অধ্যবসায় সহকারে এক বৃহদায়তন পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন এবং একজন অসামান্য মক্ষিকা-চরিত-বেত্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। জিয়োভার্ট নামক একজন দিনেমার চিত্রকর পতঙ্গ জাতির অদ্ভুত জীবন-রহস্য অধ্যয়ন করিবার জন্য ২০ বৎসর যাবৎ তন্ময় ছিলেন। রাজারাজ্ড়ার সভায় নিমন্ত্রিত হইলে তিনি এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন— “আপনারা অকারণ নানা রঙের মহামূল্য বেশভূষা করেন কেন ? আপনাদের কি লজ্জা হয় না যে, একটি অতি হেয় প্রজাপতিকে ঈশ্বর যে প্রকার সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন, আপনারা তাহার শতাংশের এক অংশও নকল করিতে পারিবেন না।” কিন্তু আমাদের

দেশের উকিল মহাশয়গণ তাস, পাশা, আড্ডা, খোসগল্প ও পরচর্চা লইয়াই অধিক সময় যাপন করেন!

য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ কি প্রকার একনিষ্ঠ সাধক তাহার আরও দুই একটি প্রমাণ দিতেছি। বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিস্ কুবেরের ন্যায় ধনশালী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তিনি ধনসম্পদ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পরীক্ষাগারে (Laboratory) আত্মহারা হইয়া প্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত থাকিতেন। ব্যাঙ্কে তাঁহার দেড় কোটী টাকা মজুত ছিল। এ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের কথা বলিতেছি; তখনকার হিসাবে দেড় কোটী টাকা আজকালকার অন্যূন সাত আট কোটী টাকার তুল্য হইবে। ব্যাঙ্কের কর্তা একদিন ক্যাভেণ্ডিসের নিকট আসিয়া সানুনয়ে নিবেদন করিলন—"মহাশয় এত অধিক টাকা শুধু পড়িয়া রহিয়াছে, যদি আদেশ করেন উহা নানা প্রকারে খাটাইয়া সুদ লাভ করিবার বন্দোবস্ত করি।" ক্যাভেণ্ডিস্ একাগ্র চিত্তে পরীক্ষা করিতেছিলেন। একবার ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের প্রতি ভ্রূকুটী কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"দূরমপসর"। কয়েক মাস পরে আর একদিন ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ এই বৈজ্ঞানিকের নিকট অনুরোধ করিলেন—"এত টাকা অকারণ ফেলে রাখা কি উচিত?" ক্যাভেণ্ডিস বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন—"যদি আমাকে পুনরায় বিরক্ত করেন তাহা হইলে ব্যাঙ্ক হইতে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইব।" প্রসিদ্ধ নিউটনের তন্ময়ত্ব বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তাহার একটি মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি যখন কোন গূঢ় ও জটিল রহস্য ভেদ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দিনের পর দিন, আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। একদিন তাহার এক বন্ধু তামাসা দেখিবার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন—নিউটনের দাসী খাবার রাখিয়া ঢাকনী দিয়া চলিয়া যাইত; বন্ধুটি একদিন আসিয়া ছুরিকাঁটা সহযোগে মুরগীটি উদরস্থ করিয়া তাহার হাড়গোড় জমা করিয়া পুনরায় ঢাকনী দিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে

যখন নিউটনের ধ্যানভঙ্গ হইল, তাঁহার মনে পড়িল মধ্যাহ্নের আহার করেন নাই ; তখন তিনি খাইতে বসিয়া ঢাকনী তুলিলেন, কিন্তু খাদ্যাবশিষ্ট কেবলমাত্র হাড় রহিয়াছে দেখিয়া মনে করিলেন কখন খাইয়াছেন ভুলিয়া গিয়াছেন এবং লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। ইহাকে বলে একনিষ্ঠা ও একাগ্রতা। পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রায় সহস্র বৎসর পুর্বে এক ভারতীয় রাসায়নিক বলিয়াছিলেন অন্যূন বার বৎসর কাল এই বিদ্যায় একাগ্রতার সহিত চর্চা না করিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। এখন এক ধুয়া উঠিয়াছে, এমন কি, এক বাঁধি গৎ শুনা যায় যে, আমাদের এ-সব করিবার দরকার নাই, হাত-পা গুটাইয়া চুপ করিয়া থাকিলেই চলিবে, যেহেতু আমরা আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ—এসব য়ুরোপেই সাজে, কারণ তাহারা সম্পূর্ণ জড়বাদী (materialistic)। যে সমস্ত মহাপুরুষদের জ্ঞান পিপাসার কথা উল্লেখ করিলাম তাহাদের তন্ময়ত্ব ও একাগ্রচিত্ততার ভিতর কতদূর অর্থকরী তৃষ্ণা ছিল তাহা আপনারা বিচার করুন।

আমাদের লেখাপড়া, মনে হয় যেন মা সরস্বতীর সঙ্গে ফাঁকিজুকি বা লুকোচুরি খেলা। কোন রকমে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাপ পাইলেই হইল। যাহা হউক আর অবসাদ ও নিরাশায় কাহিনী বিবৃত করিয়া আপনাদের মহামূল্য সময়ের অপচয় করিব না—বিশেষতঃ আমার সমক্ষে অনেক যুবক দেখিতেছি—যাঁহারা দেশের ভাবী আশার স্থল—তাঁহাদের উৎসাহ অনলের উপর শীতল বারি প্রক্ষেপ করিব না—বরং দেখিতেছি অমানিশার অবসান হইয়াছে—পূর্বদিকে অরুণের রক্তাভ রেখা উঠিতেছে—ভারতসন্তানগণের প্রতিভার উন্মেষ হইতেছে, তাহারা কিছু কিছু মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বিনা কারণে আমাদের পুণ্যভূমি বাল্মীকি ও ব্যাস, কালিদাস ও ভবভূতি, শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ, নাগার্জ্জুন ও যশোধর, বরাহমিহির ও ভাস্কর এবং আধুনিক সময়ের রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের

জন্মভূমি বলিয়া ভগবান্‌ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হয় নাই। হে ভারতের বর্তমান বংশধরগণ ! আশা করি তোমরাও তোমাদের নির্দিষ্ট কার্য্য-সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। যশঃসৌরভে আমোদিত অতীত যুগের ন্যায় ভবিষ্যতেও আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমি উন্নত মস্তকে জগৎসভায় একটু সম্মানের আসন পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবে কিনা তাহা তোমাদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

জার্ম্মানীতে বাঙালী বৈজ্ঞানিকের আদর

শ্রীমান মেঘনাদের বিষয় কিছু লিখিতে আমার বাধ বাধ ঠেকে। যদিও ইনি বি. এস্-সি. অধ্যয়ন কালে জ্ঞানঘরের সহপাঠী ছিলেন, কিন্তু গণিত শাস্ত্র ইঁহার প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র। গণিতশাস্ত্রমূলক পদার্থবিদ্যায় মৌলিক গবেষণায় জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস্-সি. উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ইনি গত বৎসর লণ্ডনে যান। সেখানে কিছুকাল গবেষণা করিয়া সম্প্রতি জার্মেনীতে গিয়াছেন। ইনি হাল নাগাদ প্রায় বিশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া সম্প্রতি লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটীতে এষ্ট্রোফিজিক্স্ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পড়েন, তাহা মুদ্রিত হইয়া আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে গ্রহ নক্ষত্রদিগের উপাদান ঘটিত অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা (Relativity) তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া ইনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার প্রতিভার পরিচয় এক নিশ্বাসে দেওয়া যায় না। Physica নামক পত্রিকার অধ্যাপক গ্রুট এই বিষয়ে যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, এখানে তাহার কয়েকটি ছত্র মাত্র উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে!

"I wish to point to the fact that his is the houour of being the first to introduce the theory of selective radiation pressure as a possible explanation for the phenomeana in the outer layer of the sun."

"অর্থাৎ গূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটন বিষয়ে অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া জয়মাল্যের তিনিই অধিকারী হইয়াছেন।"

ম্যুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক Sommerfeld পদার্থবিদ্যার আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি মেঘনাদের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, মেঘনাদকে তাঁহার গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা দিবার

জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে ছাত্রাবস্থা হইতেই মেঘনাদ জার্মান ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন। ইহা বলিলেই গণিত ও জ্যোতিষ্কমূলক পদার্থ বিদ্যায় শ্রীমান মেঘনাদের সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেহ আছেন কিনা আমি জানি না। তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমান নীলরতন, "জ্ঞানদ্বয়"* ও মেঘনাদ প্রভৃতি যে সমস্ত মৌলিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাহার সমস্তই প্রেসিডেন্সী কলেজে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অনুষ্ঠিত। এতদিন একটা অন্ধ সংস্কার ছিল যে, বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার হাওয়ায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা জন্মায় না। কিন্তু ইহারা কয়জন আমাদের দেশের যুবকবর্গের নিকট একটা আদর্শ উপস্থাপিত করিতেছেন। মেঘনাদ ও জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. এস-সি. উপাধি উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা যতগুলি গবেষণা মূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার ভগ্নাংশ মাত্র দাখিল করিলেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি. উপাধি পাইতেন, কিন্তু ইহারা মনে করেন যে, তাহাতে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির অবমাননা করা হয়। ইহার কারণ আরও বুঝাইতেছি। এবার আমি দেখিয়া আসিলাম লণ্ডন, কেম্ব্রিজ ম্যাঞ্চেষ্টার, লীড্‌স প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিদেশীয় ছাত্র (বিশেষতঃ জাপানী ছাত্র) নিজ নিজ বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করিতেছিলেন ইহাঁরা সকলেই আপন আপন দেশে তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ে ইতিপূর্বেই কাজ করিয়াছেন ; তবে বিদেশে আসিয়াছেন—সেই সেই বিষয়ে যাঁহারা মহামহোপাধ্যায় তাঁহাদের ব্যাক্তিত্বের নিকট হইতে উদ্দীপনা সংগ্রহের জন্য। এই অভিপ্রায়ে

---

* জ্ঞানদ্বয় অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। আর একজন জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম. এস-সি. সম্প্রতি যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনিও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া জ্ঞানদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবার দাবীদার হইয়াছেন।

কেহ ২৷৩ বৎসর একস্থানে থাকেন, কোথাও তিনমাস কোথাও ছয়মাস মাত্র। ইহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি কি অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য উপাধি (Doctorate) লইবার জন্য এখানে কাজ করিতেছেন? তাহা হইলে বিরক্ত হইয়া উত্তর দেন—"ওকি কথা বলেন মহাশয়! আমাদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি কোন্ অংশে হীনতর?"

বাংলাদেশে প্রতিভাশালী যুবকের অভাব নাই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উচ্চ উপাধি বা ছাপ পাইলেই বিদ্যার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। একটি চাকরি লইয়া পলাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়েন; পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে যে আমাদেরও কিছু দিবার আছে, তাহা ভুলিয়া যান। ভুলিয়া যান যে, নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী উদঘাটন করিয়াও শেষ জীবনে বলিয়াছিলেন—"আমি বেলাভূমি হইতে উপল খণ্ডের সঙ্কলন করিতেছি। জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে!" আমরা বত্রিশ কোটি ভারতবাসী, ইহার মধ্যে ত্রিশজনও মৌলিক গবেষণায় বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু জাপান কত ক্ষুদ্র দেশ, লোকসংখ্যাও ৬ কোটির অধিক হইবে কি না সন্দেহ; কিন্তু বহু জাপানী পণ্ডিত উদ্ভিদ্‌বিদ্য, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতে মৌলিকত্ব দেখাইয়া জগৎকে মোহিত করিতেছেন। কাজেই জাপান বিজ্ঞান জগতে উচ্চ ও আদৃত স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের দেশে যে কয়জনমাত্র এই ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা তাঁহাদিগকে গণনা করা যায়।

"সর্বত্র জয়মন্বিষ্যেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।" হয়ত আমার জীবনে আমার এই ইচ্ছার সফলতার দিন আসিয়াছে। আমার এই প্রিয় শিষ্যগণের গর্ভধারিণীগণ ধন্যা বঙ্গ জননীগণ যাহাতে এই প্রকার রত্ন প্রসবিনী হন, ইহাই আমি জগদীশ্বরের নিকট কামনা করি।

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান

"......আমার স্বতঃই মনে হয় আমাদের এই অধোগতির কারণ পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও অনেক সময়ে অহেতুক আসক্তি ও অপরাপর জাতির গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও অগ্রাহ্যের ভাব। এস্থানে অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণের আচার পদ্ধতি ও শিক্ষা অনেক সময়ে বর্তমান সভ্যজাতিগণের আচার পদ্ধতি হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল এবং সে সমুদয়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া মূঢ়তার লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের পরিবর্তনে অনেক বিষয়ের আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে—যেমন বাহ্যিক জগতে তেমনই মানসিক রাজ্যে। এ স্থানে প্রশ্নটি একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করা কর্তব্য। আমি আশঙ্কিত হইতেছি, পাছে কাহারও মনে অপ্রীতি সঞ্চার করিয়া ফেলি ; কিন্তু যদি স্বাধীন চিন্তা মাত্রেরই পৈতৃক সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে আমাকে বলিতেই হবে যে, পরকীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই ; যদি থাকিত তাহা হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞান বিষয়ে বর্তমান ইয়োরোপ ও আমেরিকা আমাদের অনুকরণীয় হইত। এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণের উপরেই আমার মতে ভাবী ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যে জাপান ত্রিংশবর্ষ পূর্বে ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল, জগতে যাহার অস্তিত্ব (ঐতিহাসিক হিসাবে) সন্দেহের বিষয় ছিল সেই জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজন করিয়া আজ কি এক অভিনব ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে বিরাজ করিতেছে।

এখন জ্ঞানজগতে যেনন তুমুল সংগ্রাম পার্থিব জগতেও ততোধিক। নূতনের দ্বারা পুরাতনের সংস্কার করিতেই হইবে, নচেৎ ভয় হয় ভারত-ভাগ্য-রবি প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অস্তমিত হইবে।

এখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব।

জাপানীরা জার্ম্মানী ও রুষিয়ার ন্যায় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাতৃভাষায় প্রচার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ মৌলিক গবেষণাসমূহ ইংরাজি ও জার্মান ভাষায় প্রকাশিত করেন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানের নানাবিধ মূলতত্ত্ব প্রচার হইতে পারে তজ্জন্য মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রায় একই। সমস্ত বৈজ্ঞারিক জগতে একই পরিভাষা হইলে যে কতদূর সুবিধা হয় তাহা নির্ণয় করা যায় না। জাপানীরা এই সুবিধাটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন; আমাদের তাহাই অবলম্বনীয়, কেননা উক্ত জাতির অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান।

ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃজন করা সাহিত্য সম্মেলনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্যপরিষদ এ বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন এবং শ্রীধুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ তজ্জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় সাময়িক পত্রিকায় যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, তাহাতেও এ বিষয়ে সহায়তা হইতেছে। নাগরীপ্রচারিণী সভা ভূগোল, খগোল, অর্থনীতি, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতি ঘটিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন করিয়াছেন। পরলোকগত জগন্নাথ স্বামী তেলেগু ভাষায় রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন ও তাহাতে সংস্কৃত মূলক অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি **Vernacular Text Committee** বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংকলন করিয়াছেন, এবং আশা করা যায় সাহিত্য সম্মিলনও এই অধিবেশনে একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি (**Committee of experts**) নিয়োজিত করিয়া কি ভাবে পরিভষা গৃহীত হইবে তাহার নিষ্পত্তির উপায় বিধান করিবেন।

বর্তমান সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠাতাগণ বাংলা সাহিত্যকে সাধারণ সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়া শেষোক্ত বিভাগের কার্য্যক্ষেত্র **British Association for the Advancement of Learning and Science**-এর আদর্শে যে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তাহা সদ্যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। মানবতত্ত্ব (Anthropology), পুরাতত্ত্ব ইতিহাস, লোকতত্ত্ব (Ethnology) ভূগোল, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, প্রভৃতি বিষয় আলোচনা হইয়া যাহাতে তৎ তৎ বিষয়ক গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় প্রচারিত হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আশা করি এই অধিবেশনে 'রাজসাহী বিভাগের লোকতত্ত্ব' সম্বন্ধে দুই একটি সারবান প্রবন্ধ পঠিত হইয়া ইহার সূচনা হইবে। অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে, রাজসাহীর দুইজন কৃতবিদ্য সন্তান পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে নূতন পথ দেখাইয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। বাঙালী যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে সক্ষম, সিরাজদ্দৌলা প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। আমার বন্ধু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু দুর্লভ পারসী পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেই সকল মন্থন করিয়া রত্নাবলী আহরণ করিতেছেন। তিনি যে সমুদয় বিবরণ লিখিতেছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আমি অনেক সময়ে আত্ম-বিস্মৃতি লাভ করিয়াছি, এবং নিজেকে কল্পনায় অনেক সময়ে ঔরঙ্গজেব বাদসাহের সমকালীন বলিয়া মনে করিয়াছি। তিনি দীর্ঘজীবী লইয়া এইরূপ মহৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন এবং মোগল রাজ্যের বিশাল ইতিহাস লিখিয়া মাতৃভাষার সৌষ্ঠব সাধন করেন—ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। আমাদিগের সম্মেলনের একজন উদযোক্তা শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় "মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ' প্রভৃতি শীর্ষক যে সকল প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্বারা

বাঙলা সাহিত্যের একটি অভাব মোচন হইবার সূচনা হইয়াছে। আজ আমরা নূতন জাতীয় জীবনের প্রাসাদের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান। পাঁচ বৎসর পূর্বে যে দেশে 'জাতীয় জীবন' ইত্যাদি আশা ও উৎসাহের কথা অলীক ও কবি কল্পনা প্রসূত উন্মাদোক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত, যে দেশ স্বদেশপ্রেম বলিয়া কথা বহু শতাব্দী যাবৎ বিস্মৃত ছিল, যে দেশ মাতৃভাষা ভুলিয়া এতদিন বৈদেশিক ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বার বিবেচনা করিত, সেই দেশে আজ কি এক অপূর্ব ভাব আসিয়া মৃত প্রাণকে কি এক অমৃত বারি সিঞ্চন করিয়া সঞ্জীবিত করিল! যে যুবকগণের কাষ্ঠহাসি দর্শনে পূর্বে আশঙ্কার উদ্রেক হইত, যে দেশের প্রৌঢ়গণের মিতব্যায়িতা আত্মপ্রবঞ্চনা-মূলক বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, আজ কি অপূর্ব ঈশ্বরপ্রেরিতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই যুবক সরসবদনে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি লোকসেবার জাতীয় শিক্ষায় অকাতরে বহু কষ্টসঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিল। ইহা ভাবিলেও কি প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয় না? দুই বৎসর পূর্বে যে বাঙালী যুবক পিতামাতার স্নেহক্রোড় ত্যাগ করিয়া অথবা নবপরিণীতা ভার্য্যাকে ছাড়িয়া বৈদেশিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য দূরদেশে যাইতে কুণ্ঠিত হইত, আজ জানি না কি এক অদৃষ্টপূর্ব, অচিন্ত্যপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব ভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে সেই যুবক বিদেশ যাত্রা করিল। তাই বলিতেছিলাম আমরা জাতীয় জীবনের সোপানে আজ দণ্ডায়মান—আজ নূতন আশা নূতন উদ্দীপনার দিন!

বাঙ্‌লার এমন দীনহীন কাঙাল, হতভাগ্য কে আছে ভাই, যে আজ বিধাতার মঙ্গলময় আহ্বানে আহুত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার আরতির জন্য নৈবেদ্যোপচার লইয়া সমুপস্থিত না হইবে? ধনি! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বলি! তুমি তোমার বল লইয়া বিদ্বান! তুমি তোমার অর্জিত বিদ্যা লইয়া, সকলে সমবেত হও!

আজ আমরা যুগসন্ধি স্থলে দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারত আজ

আমাদিগের দিকে সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন, স্বর্গ হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্যাবলী লক্ষ্য করিতেছেন। আজ আমরা জাতীয় জীবনের এমন এক স্তরে দণ্ডায়মান, যেখানে আমাদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ, একটি অনন্ত অমরত্বের, অপরটি অনন্ত অকীর্তির, মধ্য-পথে আর কিছু নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আরামে মজিয়া ভবিষ্যৎ প্রেরিত এই মহাভাব উপেক্ষা করি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক উপাধিতে কলঙ্কিত করিবে, ভারতাকাশের উদীয়মান রবি উষার উন্মেষেই হায় আবার অস্তমিত হইবে।

কিন্তু আজ আশার দিন আজ উদ্দীপনার যুগ। বাঙলা এ আহ্বান উপেক্ষা করে নাই—সতীশচন্দ্র ও রাধাকুমুদের ন্যায় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী যুবক, সুবোধচন্দ্র ব্রজেন্দ্রকিশোর, সূর্য্যকান্ত, মণীন্দ্রচন্দ্র তারকনাথ, যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি ধনাঢ্যগণ যে দেশের জাতীয় শিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত, সে দেশ নিশ্চয়ই উঠিবে—সে দেশের ভাষা ও বিজ্ঞান কখনই উপেক্ষিত থাকিবে না। যাহাতে অধীতবিদ্যা বিজ্ঞানবিদ ছাত্রগণ বৃত্তিলাভ করিয়া অন্নচিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ও অনন্যমনে বিজ্ঞান চর্চায় নিযুক্ত থাকিয়া বাঙলা ভাষার ও বাঙলা দেশের সেবায় মনপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, এমন উপায় নির্দ্ধারণ করুণ। সৌভাগ্যক্রমে এখন কৃতিবিদ্য ও নিষ্ঠবান ছাত্রের অভাব নাই। তাঁহারা বিলাস বিভ্রমের প্রত্যাশী নহেন, যাহাতে তাঁহাদের সাংসারিক অভাব মোচন হয় ও তাঁহারা একান্তভাবে বিজ্ঞান সেবায় ব্রতী হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করুন। জ্ঞান জাতীয় জীবনের উৎস। এই উৎসের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য আবার ভারতে নিষ্কাম জ্ঞানচর্চা প্রবর্তিত হউক।”

—০—